নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন প্রাপ্য আমানত প্রাপকদের নিকট পৌঁছে দাও। --আল-কুরআন

হুকূকুল ইসলাম
ও
হুকূকুল ওয়ালিদাইন

[ইসলামের হক, মাতা-পিতার হক, স্বামী-স্ত্রীর হক ; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং অন্যান্যদের হক সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ]

মূল
হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানভী (রহঃ)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
মাদ্রাসা দারুর রাশাদ ও জামেয়া মিল্লিয়া
মীরপুর-১২, ঢাকা।

আল-কাউসার প্রকাশনী
২১৭, ব্লক-ত, মীরপুর-১২, ঢাকা।

সূচীপত্র

হুকূকুল ইসলাম

হুকূকুল ওয়ালিদাইন

হুকূকুল ইসলাম

আল্লাহ তাআলার হক

মানুষের সর্বপ্রথম দায়িত্ব হলো আল্লাহ তাআলার হক আদায় করা যিনি মানব জাতিকে নানান ধরণের নেয়ামত দান করেছেন এবং গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে হেদায়াতের আলো দান করেছেন। আবার হেদায়াতানুযায়ী আমলের প্রতিদানস্বরূপ বিভিন্ন প্রকারের নেয়ামতের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

মানুষের দায়িত্বে আল্লাহ তাআলার হক চারটি—

(১) কুরআন হাদীস অনুযায়ী আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা।

(২) যেইসব আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক, লেন-দেন, কাজ-কারবার আল্লাহ তাআলার পছন্দনীয় তা গ্রহণ করা।

(৩) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি এবং ভালোবাসাকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেওয়া।

(৪) মানুষের সাথে ভালোবাসা-শত্রুতা, দয়া-মায়া ইত্যাদি সব কিছুই আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য হওয়া।

নবী-রাসূলগণের হক

আল্লাহ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী, আল্লাহ তাআলার পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির পরিচয় আমরা যে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে লাভ করেছি তাদের নিকট আল্লাহ তাআলা অহী প্রেরণ করেছেন। অনুরূপভাবে ইহকালীন অনেক ভালো-মন্দ ও উপকার-অপকারের কথা আমরা নবী-রসূলদের

মাধ্যমে জানতে পেরেছি। অসংখ্য ফেরেশতা আমাদের কল্যাণে নিয়োজিত। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তারা আমাদের অনেক মঙ্গলজনক কাজ সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। এজন্য আম্বিয়া (আঃ) ও ফেরেশতাদের হক আল্লাহ তাআলার হকের অন্তর্ভুক্ত। নবীদের মধ্যে আমাদের প্রতি বিশেষতঃ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দয়া ও এহছান সবচেয়ে বেশী। তাই তার হকও সবচেয়ে বেশী। সুতরাং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কয়েকটি হক নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

(১) হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নবূওয়তের বিশ্বাস স্থাপন করা।

(২) যে কোন ব্যাপারে তাঁর অনুসরণ করা।

(৩) তাঁর অসীম মর্যাদা ও গভীর ভালোবাসা মনে স্থান দেওয়া।

(৪) তাঁর উপর দরুদ পড়া।

ফেরেশতাদের হক

ফেরেশতাদের হক নিম্নরূপ—

(১) ফেরেশতাদের অস্তিত্বের উপর বিশ্বাস রাখা।

(২) তাদেরকে নিষ্পাপ বলে বিশ্বাস করা।

(৩) তাদের নাম শুনে আলাইহিস সালাম (তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা।

(৪) দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু (যেমন পিঁয়াজ, রসুন, মুলা, বিড়ি-সিগারেট ও তামাক ইত্যাদি) খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করলে কিংবা মসজিদে বায়ু ছাড়লে ফেরেশতাদের কষ্ট হয় বিধায় এসব ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা এবং

অন্য যেসব কাজে ফেরেশতাদের কষ্ট হয় তা হতে বেঁচে থাকা। যেমন ছবি রাখা, শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত কারণ ছাড়া কুকুর পালন করা, মিথ্যা কথা বলা কিংবা অলসতা শতঃ ফরয গোসল না করা অথবা শরয়ী কিংবা স্বাভাবিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে উলঙ্গ হওয়া।

সাহাবা ও নবী পরিবারের হক

সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) ও নবী পরিবারের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইহলৌকিক ও পরলৌকিক উভয় ধরনের সম্পর্ক রয়েছে। তাই এদের হক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকেরই অন্তর্ভুক্ত। সাহাবা ও নবী পরিবারের হকের মধ্যে কয়েকটি নিম্নরূপ—

(১) তাদের আনুগত্য করা।

(২) তাদেরকে ভালবাসা।

(৩) তাদের ন্যায়পরায়ণ, বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হওয়ার বিশ্বাস রাখা

(৪) যারা তাদেরকে ভালবাসে তাদেরকে ভালবাসা এবং যারা তাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তাদের সাথে শত্রুতা রাখা।

উলামা-মাশায়েখদের হক

আলেম সমাজ যেহেতু যাহেরী বাতেনী সর্বদিক দিয়েই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উত্তরাধিকারী ও স্থলাভিষিক্ত, তাই তাদের হকসমূহও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হকেরই অন্তর্ভুক্ত।

উলামা মাশায়েখের হক হলো—

(১) ইসলামী আইনের বিশেষজ্ঞ, হাদীস বিশারদ, মাসায়েলে তরীকত, সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ ও ধর্মীয় পুস্তক রচয়িতাদের মঙ্গলের জন্য সর্বদা দোআ করতে থাকা।

(২) শরীয়ত অনুমোদিত কাজে তাদের আনুগত্য করা।

(৩) তাদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তাদেরকে সম্মান ও ভালবাসা এবং তাদের সাথে শত্রুতা ও বিরোধিতা না করা।

(৪) নিজের সামর্থ্য ও প্রয়োজনানুযায়ী তাদের আর্থিক সাহায্য করতে থাকা।

মাতা-পিতার হক

এতক্ষণ যাদের হকের কথা বলা হলো তারা ছিলেন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের দ্বীনী নেয়ামত লাভের মাধ্যম। সেজন্য তাদের হক আদায় করা অপরিহার্য্য আবার কারো কারো মাধ্যমে আমরা দুনিয়াবী নেয়ামতও লাভ করেছি। শরীয়তের দৃষ্টিতে তাদের হক আদায় করাও জরুরী। যেমন—মাতা-পিতা। আমাদের জন্ম ও লালন-পালনের ব্যাপারে তাদের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের হক হলো—

(১) মাতা-পিতাকে কোনপ্রকার কষ্ট না দেওয়া যদিও তাদের পক্ষ থেকে কোন বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

(২) আমাদের আচার-আচরণ কথা-বার্তায় তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

(৩) শরীয়ত সমর্থিত সকল কাজে তাদের কথা মেনে চলা।

(৪) যদি প্রয়োজন হয় তবে তাদের আর্থিক সাহায্য সহযোগিতা করা (যদিও তারা কাফের হয়)।

মৃত্যুর পর মাতা-পিতার হক

(১) মৃত্যুর পর তাদের জন্য গোনাহ মাফ ও রহমতের দোআ করতে থাকা এবং নফল ইবাদত সদকা খয়রাত ও অন্যান্য ইবাদত করে ইহার সওয়াব তাদের জন্য বখশিয়া দেওয়া।

(২) জীবদ্দশায় তারা যাদের সাথে উঠাবসা করতেন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা। প্রয়োজনে তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করা।

(৩) তাদের কোন ঋণ থাকলে তা আদায় করে দেওয়া

(৪) কখনও কখনও তাদের কবর যেয়ারত করা।

মাতাপিতার হক সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

[অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]

সন্তানের উপর পিতা-মাতার হক্কসমূহ

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার উপর সন্তানদের হক্কসমূহ যেভাবে বর্ণনা করেছেন এভাবেই সন্তানদের উপর মাতা-পিতার হক্কসমূহ ও অন্যান্য দায়িত্বও বর্ণনা করেছেন। বরং তিনি উহাকে ঈমানের অংশ বিশেষ সাব্যস্ত করেছেন। কুরআন মজিদ যা আল্লাহতায়ালার নিকট থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে অবতীর্ণ হয়েছে উহাতে পিতা-মাতার সেবা এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের আদেশ, আল্লাহর একত্ববাদ এবং ইবাদতের সঙ্গে সঙ্গেই এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা বুঝা যায় যে মানবজাতির কর্মসমূহে আল্লাহ তাআলার ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার সেবা এবং তাদিগকে সুখ-শান্তির দিবার স্থান।

সূরায়ে বনি ইসরাঈলে এরশাদ হয়েছে ঃ "তোমার প্রভুর কঠোর আদেশ

এই যে, শুধু তারই ইবাদত কর এবং পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার এবং তাদের সেবাযত্ন কর।"

সূরায়ে লুকমানে পিতা-মাতার হক্ক বর্ণনা করতে গিয়ে এক পর্যায়ে ইহাও বর্ণনা করেছেন যে, যদি কারও পিতা-মাতা মুশরিক হয় এবং সন্তানকেও শিরক ও কুফর করার জন্য বাধ্য করে তখন সন্তানদের কর্তব্য হবে তাদের কথায় কুফর এবং শিরক না করে। তবে দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার এবং তাদের খেদমত করতে থাকবে।

নিম্নে বর্ণিত হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার হক্কসমূহ এবং তাদের সম্পর্কীয় সন্তানদের কর্তব্য সম্বন্ধে যা কিছু এরশাদ করেছেন উহা প্রকৃতপক্ষে কুরআন মজীদের আয়াত সমূহের ব্যাখ্যা বা তাফসীর।

মাতা-পিতার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি সন্তানদের জান্নাত এবং জাহান্নাম

✪ হযরত আবু উমামা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানদের উপর পিতা-মাতার হক্ক কতটুকু? তিনি উত্তরে বললেন, পিতা-মাতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।

অর্থাৎ যদি তুমি পিতা-মাতার অনুগত হও এবং তাদের খেদমত কর; এতে তাঁরা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকে তবে তুমি জান্নাত পাবে। পক্ষান্তরে, তুমি যদি তাদেরকে কষ্ট দাও এবং তাঁরা অসন্তুষ্ট হন তাহলে তোমার ঠিকানা দোযখে হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা-মাতার সন্তুষ্টির সঙ্গে জড়িত

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, "আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আপন প্রভু ও মনিবের সন্তুষ্টি কামনা করে তার কর্তব্য আপন পিতাকে সন্তুষ্ট রাখা। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য পিতার সন্তুষ্টি শর্ত এবং পিতার অসন্তুষ্টির অবশ্যম্ভাবী ফল আল্লাহর অসন্তুষ্টি। সুতরাং, যে ব্যক্তি পিতাকে অসন্তুষ্ট করবে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে।

উক্ত হাদীসে 'ওয়ালেদ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা আরবী ভাষায় শুধু 'পিতার' অর্থ প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার হয়। এ হিসাবে উক্ত হাদীসে মাতার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। কিন্তু অন্যান্য হাদীসসমূহে মাতার মর্যাদা পিতা হইতেও উচ্চে বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এজন্য মাতার সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টিরও ঐ গুরুত্বই হবে এবং উহার ঐ মর্যাদাই হবে যা এই হাদীসে পিতার সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে।

মাতার হক্ক পিতার হক্ক থেকে অধিক

✪ হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার নিকট থেকে সেবা এবং সদ্ব্যবহার পাওয়ার কার দাবী অধিক? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমার মা, আমি আবার বলছি তোমার মা, আমি আবার বলছি তোমার মা, ইহার

পরে তোমার পিতার হক্ক, ইহার পর তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়, ইহার পর যে তোমার নিকটবর্তী আত্মীয়। —বুখারী ও মুসলিম

বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবায় অবহেলাকারী দুর্ভাগা

✪ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, সে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হোক। জিজ্ঞাসা করা হলো ইয়া রাসুলুল্লাহ সে কে? তিনি বললেন, দুর্ভাগা ঐ ব্যক্তি যে পিতা-মাতা উভয়কে বা তাদের মধ্যে একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়ে সেবা করে জান্নাত অর্জন করতে পারে নাই। —মুসলিম

ফায়েদা ঃ হযরত আবু উমামার হাদীস যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে বলা হয়েছে যে, মাতা-পিতা তোমার জান্নাত এবং তোমার দোযখ। (অর্থাৎ মাতা-পিতার খেদমত এবং সুখ-শান্তি দেওয়া জান্নাত অর্জনের একটি উপায় এবং উহার বিপরীত তাদের অবাধ্য হওয়া এবং দুঃখ ও কষ্ট দেওয়া মানুষকে দোযখী বানায়। ইহা আরো স্পষ্ট যে পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে পৌছে তখন খেদমতের ও শান্তির দিকে অত্যন্ত মুখাপেক্ষী হয়। ঐ সময়ে তাদের খেদমত আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য আমল এবং জান্নাতে পৌছবার সোজা সিঁড়ি। আল্লাহতায়ালা যেই বান্দাকে এ সুযোগ করেছেন এবং সে পিতা-মাতা উভয়কে বা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পায় এবং তাদের খেদমত করে জান্নাত পর্যন্ত পৌছতে পারে নাই নিঃসন্দেহে সে দুর্ভাগা। তাদের সম্পর্কেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন—সেই ব্যক্তি অপমানিত, লাঞ্ছিত হোক।

কোন্ কোন্ অবস্থায় পিতা-মাতার খেদমত করা হিজরত এবং জিহাদ থেকেও অগ্রগণ্য

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন একদা জনৈক ব্যক্তি হুযুরের নিকট এসে আরয করল, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি জিহাদে যেতে চাই। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমার পিতা-মাতা আছে? সে উত্তরে বলল, জ্বি আছে। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন তাদের খেদমত ও সুখ সুবিধা দিবার জন্য চেষ্টা কর। (ইহাই তোমার জন্য জিহাদ।) —আবু দাউদ

ফায়েদা ঃ হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা বুঝতে পেরেছিলেন বা সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল যে তার পিতা-মাতা তার খেদমতের মুখাপেক্ষী এবং সে তার পিতা-মাতার অনুমতি ব্যতীত জিহাদের জন্য এসেছে। এজন্য তিনি তাকে বাড়ীতে পিতা-মাতার খেদমত করার জন্য আদেশ দিলেন কেননা এই অবস্থায় মাতা-পিতার খেদমত অগ্রগণ্য।

উল্লেখিত হাদীসের মর্ম এই নয় যে, যাদের মাতা-পিতা আছে তারা জিহাদের জন্য যেন ঘর থেকে বের না হয়। শুধু ঐ সকল ব্যক্তি জিহাদে যাবে যাদের পিতা-মাতা নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যে সকল ছাহাবা যুদ্ধ করেছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশেরই পিতা-মাতা জীবিত ছিলেন।

✪ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে জনৈক ব্যক্তি ইয়ামান থেকে হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছল। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ামানে তোমার কে আছে? সে বলল, আমার পিতা-মাতা আছে। তিনি পুনঃ

জিজ্ঞাসা করলেন, তারা কি তোমাকে অনুমতি দিয়াছে? সে বলল অনুমতি দেয় নাই। তিনি পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাওয়ার আদেশ দিলেন এবং জিহাদে বা দ্বীনের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য অনুমতি চাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন। যদি তারা তোমাকে অনুমতি দান করে তখন এসে জিহাদে শরীক হয়ে যাও। যদি অনুমতি না দেয় তবে তাদের খেদমত কর এবং তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে থাক। —আবু দাউদ, আহমদ

ফায়েদা ঃ হিজরতকারী এবং জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে চিন্তাধারা এবং আদর্শ ছিল উহার আলোতে এই প্রকার সকল হাদীস সম্বন্ধে এ কথাই বলা যায় যে, উহার সম্বন্ধ ঐ ক্ষেত্রে যখন পিতা-মাতা খেদমতের মুখাপেক্ষী হয় এবং অন্য কেউ তাদের সেবার জন্য না থাকে এজন্য তারাও অনুমতি না দেয়। এ ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে তাদের খেদমত হিজরত ও জিহাদ থেকে অগ্রগণ্য হবে।

মার পায়ের নীচে বেহেশত

✪ হযরত মুয়াবীয়া ইবনে জাহেমা থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন যে, জাহেমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি এবং এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে এসেছি। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কি মা আছে? জাহেমা বললেন হাঁ, আমার মা আছে। তিনি বললেন, তার সঙ্গে থাক, তার খেদমত কর, তার পায়ের নীচে তোমার বেহেশত। —আহমদ ও নাসায়ী

মাতার সেবা বড় বড় গুনাহ মাফের উছিলা

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রসুলুল্লাহ! আমি অত্যন্ত বড় একটি গোনাহ করেছি, আমার তাওবা কবুল হবে? আমি ক্ষমা পেতে পারি কি? তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন? সে ব্যক্তি উত্তর দিল আমার মা জীবিত নাই। হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? ঐ ব্যক্তি উত্তর দিল, হাঁ, খালা জীবিত আছেন। তিনি তখন বললেন, তার খেদমত কর এবং তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। (আল্লাহ তায়ালা সেই বরকতে তোমার তাওবা কবুল করে ক্ষমা করে দিতে পারেন। —তিরমিযী

ফায়েদা ঃ তাওবা কি? অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহর নিকটে কৃত গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়া, যেন আল্লাহর গযব এবং শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে, গুনাহের কারণে যেই শাস্তির উপযুক্ত হয়েছে। তাওবা কবুল হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তার প্রতি রাযি হয়ে যান। সকল নেক আমলেরই এই বৈশিষ্ট্য যে, গুনাহসমূহের মন্দ প্রভাবকে নিশ্চিহ্ন করে দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও দয়া টেনে নিয়ে আসে। কিন্তু কোন কোন নেক আমলে এ ব্যাপারে অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উক্ত হাদীস থেকে বুঝা যায় পিতা-মাতার খেদমত তদ্রূপ খালা, নানীর খেদমতও ঐসকল আমলের অন্তর্ভুক্ত যার বরকতে আল্লাহ তায়ালা বড় বড় গুনাহগারদের তাওবা কবুল করে ফেলেন এবং তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

মাতা-পিতার মৃত্যুর পর তাদের বিশেষ হক্কসমূহ

পিতা-মাতার হক্কসমুহ সন্তানের উপর হইতে জীবনের সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না বরং তাঁদের মৃত্যুর পর তাদের কিছু অন্যান্য দাবীসমূহ সন্তানদের উপর আপতিত হয় যা আদায় করতে থাকা সৌভাগ্যশালী সন্তানদের কর্তব্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রহমত পাওয়ার পন্থাস্বরূপ।

✪ আবু উছাইদ সায়ীদী থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। বনি সালমার এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতার আমার উপরে এমন কোন হক্ক আছে যা তাঁদের মৃত্যুর পর আমার আদায় করতে হবে? তিনি এরশাদ করলেন, হাঁ,তাঁদের মঙ্গলের জন্য দোয়া করতে থাকা, তাঁদের জন্য ক্ষমা এবং মাফের প্রার্থনা করা, কারো সঙ্গে তাঁদের অঙ্গীকার বা চুক্তি থাকলে তা পূরণ করা, তাঁর মাধ্যমে যে আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের প্রতি খেয়াল রাখা এবং তাদের হক্ক আদায় করা এবং তার বন্ধু-বান্ধবের সম্মান করা।

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, যদি কেউ নিজের পিতাকে কবরের মধ্যে আরাম দিতে চায় এবং তাঁর খেদমত করতে চায় তাহলে পিতার মৃত্যুর পর পিতার ভাইদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে। —ইবনে হাব্বান

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে, পিতার খেদমত এবং তাঁর সাথে সদ্ব্যবহারের উত্তম খেদমত হলো এই যে, তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখা এবং পিতার মুহাব্বতের হক্ক আদায় করা। —মুসলিম

ফায়েদা ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের উক্ত দুইটি হাদীসে পিতার ভাইদের এবং বন্ধুদের আলোচনা করা হয়েছে। এ কথাটুকু পূর্বেই জানা গেছে যে, মাতার হক্ক পিতা হইতে অধিক। ইহা ব্যতীত আবু উছাইদ (রাঃ)এর বর্ণনায় পিতা-মাতার আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার এবং তাদের দোস্ত আহবাবদেরকে সম্মান করা পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সন্তানদের কর্তব্য।

✪ হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এমনও হতে পারে কোন ব্যক্তির পিতামাতা উভয়ই বা তাদের কোন একজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তাদের সন্তান তাদের জীবদ্দশায় অবাধ্য ছিল এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট করা থেকে বঞ্চিত ছিল। কিন্তু এ সন্তান তাদের ইন্তেকালের পরে তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মঙ্গল ও দয়া এবং ক্ষমা ও বখশিশের জন্য দোয়া করতে থাকে। (এভাবে সে নিজের ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করতে চায়।) আল্লাহতায়ালা এ অবাধ্য সন্তানকে বাধ্যগত বলে সাব্যস্ত করেন। (সে পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি থেকে বেঁচে যায়) —বায়হাকী

ফায়েদা ঃ যেভাবে পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের বাধ্য হওয়া, খেদমত করা এবং সদ্ব্যবহার করা উচ্চস্তরের নেক কাজ যা বড় বড় গুনাহকে শেষ করে দেয় সেভাবে তাঁদের মৃত্যুর পর একনিষ্ঠতা সঙ্গে তাঁদের জন্য ক্ষমার ও রহমতের দোয়া এমন আমল যা একদিকে পিতা-মাতার জন্য কবরের মধ্যে আরাম ও শান্তির কারণ হয় অন্যদিকে সন্তানের ঐ ত্রুটির ক্ষতিপূরণ হয়ে যায় যা পিতা-মাতার বাধ্যতা এবং খেদমতের মধ্যে হয়েছিল। সে নিজেও আল্লাহর রহমত ও দয়া পাওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায়। কুরআন শরীফে সন্তানগণকে বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন

আল্লাহর নিকটে পিতা-মাতার জন্য রহমত ও ক্ষমা চাইতে থাকে।

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِي صَغِيرًا ۝

আল্লাহ তায়ালার নিকট আরয কর হে প্রভু! আমার পিতা-মাতার উপর দয়া কর যেভাবে তারা আমাকে ছোটবেলায় (দয়ার সঙ্গে) লালন পালন করেছিল।

পিতা-মাতার সেবা এবং বাধ্য হওয়ার পার্থিব উপকারিতা

পিতা-মাতার সেবা এবং বাধ্য থাকার প্রকৃত প্রতিদান জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি যেমন ঐ হাদীসসমূহের দ্বারা বুঝা গেছে যা 'মাতা-পিতার হক্ব' শিরোনামে উল্লেখ করা গেছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, পিতা-মাতার খেদমতকারী এবং হুকুমপালনকারী সন্তানগণকে আল্লাহতায়ালা বিশেষ বরকত এ দুনিয়ার মধ্যেও দিয়ে থাকেন।

✪ হযরত জাবির (রাঃ) হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান—"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পিতা-মাতার খেদমত, বাধ্যতা এবং সদ্ব্যবহারের কারণে সন্তানের আয়ু বৃদ্ধি করেন।" —ইবনে মাজা

ফায়েদা ঃ এই প্রকারের হাদীসসমূহ তাকদীরের মাসআলার সঙ্গে কোন সংঘর্ষ বা বৈপরিত্ব নাই। কেননা আল্লাহ তায়ালার প্রথম থেকেই এ কথা জানা ছিল যে, ঐ ব্যক্তি পিতা-মাতার বাধ্য ও খেদমত করবে, এ হিসাবে তার আয়ু অতিরিক্ত নির্ধারিত করা হয়েছে যা পিতা-মাতার খেদমত এবং বাধ্য না থাকার বেলায় দেওয়া হতো। এভাবে ঐসকল

হাদীসকেও বুঝা উচিত যার মধ্যে কোন ভাল কাজের কারণে রিযিকে বরকত ও প্রশস্ততার সুসংবাদ দান করা হয়েছে অথচ রিযিকের প্রশস্ততা ও অপ্রশস্ততাও পূর্ব নির্ধারিত।

✪ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান, "আপন পিতা-মাতার খেদমত কর এবং বাধ্য থাক তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের খেদমত করবে এবং হুকুম মান্য করবে। তোমরা আপন চরিত্রকে পাক-পবিত্র রাখ তোমাদের স্ত্রীগণ পাক-পবিত্র থাকবে। —তবরানী

অর্থাৎ যে সন্তান পিতা-মাতার বাধ্য থাকবে এবং খেদমত করবে আল্লাহ তায়ালা তার সন্তানকে তার বাধ্য এবং খেদমতকারী বানিয়ে দিবেন। এমনিভাবে যারা পাক-পবিত্র জীবন যাপন করবে আল্লাহ তায়ালা তাদের বিবিগণকে পাক-পবিত্র জীবন যাপন করার সুযোগ করে দিবেন।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পিতা-মাতার বাধ্য থাকাকে এবং তাদেরকে আরাম পৌছানকে জান্নাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির কারণ এবং উচ্চস্তরের সৎ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছেন তেমনিভাবে তাদের অবাধ্য হওয়া এবং কষ্ট দেওয়াকে কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম অর্থাৎ সর্বনিকৃষ্ট গুনাহসমূহের মধ্যে একটি বলে বর্ণনা করেছেন।

✪ হযরত আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বড় বড় গুনাহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো। (যে বড় গুনাহ কি কি?) তিনি উত্তরে ফরমাইলেন, "(১) খোদার সঙ্গে শরীক করা (২) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া এবং কষ্ট দেওয়া (৩) কোন ব্যক্তিকে অন্যায় ভাবে হত্যা করা (৪) এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।"

ফায়েদা ঃ বুখারীর অন্য এক রেওয়ায়াতেও এই সকল গুনাহকে সর্ববৃহৎ গুনাহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেই ক্রমানুসারে তিনি এগুলোর বর্ণনা দিয়েছেন ইহা দ্বারা বুঝা যায় শিরকের পরেই পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার স্থান এমন কি হত্যা করার স্থানও ইহার পরে।

✪ হযরত ইবনে আমর হইতে বর্ণিত—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, "নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া কবীরা গুনাহসমূহের মধ্যে একটি। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কোন ব্যক্তি কি নিজের পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এভাবে গালি দিতে পারে, যেমন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির মাতা-পিতাকে গালি দিল তখন এই ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দিল। (সে যেন নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়াইল।) —বুখারী ও মুসলিম

ফায়েদা ঃ এই হাদীস দ্বারা বুঝা গেল যে, কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে গালি দেওয়া বা কোন মন্দ কথা বলা যার ফলে দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির মা-বাপকে গালি দিতে লাগল। ইহা এত মন্দ কাজ যেমন নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া মন্দ কাজ। ইহা কবীরা গুনার অন্তর্ভুক্ত। ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে হুযুরের শিক্ষার মধ্যে পিতা-মাতার মর্যাদার স্থান অতি উচ্চে এবং এ ব্যাপারে মানুষের কতটুকু সতর্ক থাকা চাই।

দাদা-দাদী ও নানা-নানীর হক

দাদা-দাদী ও নানা-নানী শরীয়তের দৃষ্টিতে মা-বাপের মতই শ্রদ্ধার পাত্র। এজন্য তাদের হকও মা-বাপের হকের ন্যায়। অনুরূপভাবে খালা ও মামা মায়ের ন্যায় এবং চাচা ও ফুফী বাপের ন্যায়। হাদীস শরীফেও এ ধরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের হক

সন্তানের প্রতি যেমন মা-বাপের হক রয়েছে তেমনি মা-বাপের প্রতিও সন্তানের কিছু হক রয়েছে, যেমন—

(১) সতী সাধ্বী ও চরিত্রবান মহিলাকে বিবাহ করা যাতে তার ঔরসে সুসন্তান জন্ম লাভ করে।

(২) শিশুকালে যত্ন ও স্নেহ মমতার সাথে সন্তানদেরকে লালন-পালন করা। ইহার অনেক ফযীলত রয়েছে। বিশেষতঃ কন্যা সন্তানের লালন-পালনের ব্যাপারে মনে কোন সংকোচ দেখা না দেওয়া। কন্যা সন্তান লালন-পালনের ফযীলতও অপরিসীম। ধাত্রীর দুধপান করাতে হলে চরিত্রবান ও দ্বীনদার ধাত্রী খুঁজে নেওয়া কেননা শিশুর চরিত্র গঠনে দুধের প্রভাব অবশ্যই পড়ে থাকে।

(৩) দ্বীনী ইলম ও আদব শিক্ষা দেওয়া।

(৪) বিবাহের বয়স হলে অবিলম্বে বিবাহ দেওয়া। বিবাহিতা কন্যার যদি স্বামী মারা যায়, তাহলে দ্বিতীয় বিবাহ হওয়া পর্যন্ত নিজের ঘরে তাকে সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকতে দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা।

দুধমাতা বা ধাত্রীর হক

দুধপান করানোর কারণে ধাত্রীও মায়ের সমতুল্য, তার হক হলো-

(১) তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করা।

(২) সম্ভব হলে তার যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করার ব্যাপারে কার্পন্যতা না করা।

(৩) সামর্থ্য থাকলে একটি দাস বা দাসী খরিদ করে খেদমতের জন্য তাকে দান করা।

(৪) তার স্বামীর সাথেও সদয় আচরণ করা।

সৎ মায়ের হক

সৎ মা বাপের সহধর্মীনী এবং হাদীস শরীফে বাপের আপনজনদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ এসেছে। তাই সৎ মায়েরও কিছু হক আছে। মা-বাপের মৃত্যুর পর যে যে হক পালন করার কথা বলা হয়েছে সৎ মায়ের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

ভাই-বোনের হক

হাদীস শরীফে আছে, বড় ভাই বাপের সমান। অতএব ছোট ভাই ছেলের সমান এবং সন্তান ও পিতার মাঝে পরস্পর যে হকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ভাইদের মধ্যে পরস্পর সেই সব হক পালন করতে হবে। বড় বোন আর ছোট বোনের অবস্থাও তদ্রূপ।

আত্মীয়-স্বজনের হক

অনুরূপভাবে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে পরস্পর কিছু হক আছে। যা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হলো।

(১) মাহারিম তথা যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তাদের কারো যদি কর্মসংস্থান বা উপার্জনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে নিজ সন্তানের ন্যায় সামর্থ্য অনুযায়ী তাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। আর গায়রে মাহরাম তথা যাদের সাথে রক্তের সম্পর্ক নাই এবং বৈবাহিক সম্পর্ক জায়েয, তাদের খোরপোষের ব্যবস্থা করা, এতটুকু প্রয়োজন না হলেও কিছু খেদমত করা আবশ্যক।

(২) মাঝে মধ্যে আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা এবং খোঁজ-খবর লওয়া।

(৩) কোন ভাবেই আত্মীয়তা সম্পর্ক ছিন্ন হতে না দেওয়া বরং কেউ কোন কষ্ট দিলেও তাতে ধৈর্য্য ধারণ করা উত্তম।

(৪) নিকটতম কোন মাহরাম যদি ঘটনাক্রমে মালিকানায় এসে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ সে আযাদ হয়ে যায়।

পীর ও উস্তাদের হক

উস্তাদ ও পীর বাতেনী তরবিয়াতের (আত্মশুদ্ধির) দিক থেকে বাপের মত। এজন্য তাদের সন্তানাদি এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে নিজের মা-বাপ ও আত্মীয়-স্বজনের ন্যায় আচরণ করা দরকার।

لَا اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى -

তোমাদের নিকট আমি আত্মীয়তার সৌহার্দ-সম্প্রীতি ছাড়া কোন প্রতিদান চাইনা।

ইহার এইটাও একটি ব্যাখ্যা। এতে শাসকমণ্ডলীকে সম্মান করার প্রয়োজনীয়তাও প্রমাণিত হয়। আবার যেহেতু ছাত্র ও মুরীদ সন্তানতুল্য এজন্য উস্তাদের ছাত্র ও পীরের মুরীদের সাথে আপন ভাইয়ের ন্যায়

ব্যবহার করতে হবে। وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ বলতে ছাত্র ভাই এবং পীর ভাইকেও বুঝানো হয়েছে।

ছাত্র ও মুরীদের হক

ছাত্র ও মুরীদ যেহেতু সন্তানতুল্য সেজন্য স্নেহ-মমতা ও আন্তরিকতার বেলায় তাদের হক সন্তানের হকের ন্যায়।

স্বামী-স্ত্রীর হক

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর হক হলো—

(১) সামর্থ্য অনুযায়ী স্ত্রীর খোরপোষ দিতে অবহেলা না করা।

(২) স্ত্রীকে দ্বীনী মাসআলা-মাসায়েল শিখাতে থাকা এবং নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকা।

(৩) মাহরাম আত্মীয়-স্বজনের সাথে মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ করার সুযোগ দেয়া এবং তাদের অসাবধানতা ও বুদ্ধিমত্তার অভাবে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে ধৈর্য্য ধারণ করা। কখনো শাসন ও সংশোধনের প্রয়োজন হলে ভারসাম্য রক্ষা করা।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর হক— (১) যথাযথভাবে স্বামীর আনুগত্য করা, আদব, খেদমত, মন জয় ও সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করা তবে শরীয়ত বিরোধী কোন কাজ হলে এতে অপারগতা প্রকাশ করবে।

(২) স্বামীর সামর্থের অতিরিক্ত কোন চাপ সৃষ্টি না করা।

(৩) অনুমতি ছাড়া স্বামীর সম্পদ ব্যয় না করা।

(৪) স্বামীর আত্মীয় ও আপন জনদের সাথে এমন ব্যবহার না করা যাতে তার মনে কষ্ট হয়। বিশেষতঃ স্বামীর মা-বাপকে সেবার পাত্র মনে করে যথাসম্ভব শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা।

স্বামী-স্ত্রীর হক সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস

[অনুবাদক কর্তৃক সংযোজিত]

স্ত্রীর উপর সবচাইতে বড় হক্ক তার স্বামীর

✪ হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, মহিলার উপর সবচাইতে বড় হক্ক তার স্বামীর এবং পুরুষের উপর সবচাইতে বড় হক্ক তার মাতার। —হাকিম

যদি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে সিজদা করার অবকাশ থাকত তবে মহিলাদের উপর স্বামীদেরকে সিজদা করার হুকুম হতো।

✪ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান—যদি আমি কোন মানুষকে অন্য কোন সৃষ্ট জীবকে সিজদা করার হুকুম দিতাম তাহলে মহিলাদেরকে হুকুম দিতাম যেন তারা নিজ নিজ স্বামীগণকে সিজদা করে।

ফায়েদা ঃ কোন সৃষ্ট জীবের অন্য সৃষ্টজীবের উপরে যে হক্ক আছে উহা বর্ণনা করার জন্য এর থেকে অধিক ফলদায়ক দ্বিতীয় অন্য কোন পদ্ধতি নাই যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ হাদীসের মধ্যে স্ত্রীদের উপর স্বামীদের হক্ক বর্ণনা করার জন্য গ্রহণ করেছেন। হাদীসের উদ্দেশ্যও ইহাই, কোন মহিলা কারো স্ত্রী হয়ে যাওয়ার পর খোদার হক্কের পরে তার উপর সর্বাধিক হক্ক তার স্বামীর হয়ে থাকে। তার উচিত হবে স্বামীর অনুগত থাকা এবং তার সন্তুষ্টির জন্য সদা সচেষ্ট থাকা।

✪ ইমাম আহমদ (রাঃ) এ বিষয়ের একটি হাদীস মাসনাদ নামক কিতাবে হযরত আনাছ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, "কোন মানুষের জন্য অন্য মানবকে সিজদা করা জায়েয নাই যদি ইহা জায়েয হতো তাহলে আমি মহিলাকে

আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্যে কেননা তার উপর তার স্বামীর অনেক দাবী রয়েছে।"

ইবনে মাজাতে এ বিষয়টিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবি আউফর একটি রেওয়ায়েত হযরত মায়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)এর একটি ঘটনার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। বিখ্যাত আনসারী ছাহাবা হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ) একদা শাম দেশে গিয়েছিলেন। ঐখান থেকে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে সিজদা করলেন, নবী আলাইহেচ্ছালাম আশ্চর্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন–হে মুয়ায ! ইহা কি করছ? তিনি আরয করলেন, আমি শাম দেশে গিয়েছিলাম, সেই জায়গার মানুষকে দেখলাম তাদের ধর্মীয় ইমামগণকে, আলেমগণকে দলীয় নেতাগণকে সিজদা করে। তাই আমার অন্তরে এসেছে, আমরাও আপনাকে সিজদা করব। তিনি এরশাদ করলেন, এমনটি করো না। অতঃপর এরশাদ ফরমাইলেন ঃ

✪ "আমি যদি কাউকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মাখলুককে সিজদা করার জন্য হুকুম দিতাম তবে মহিলাকে আদেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করার জন্য।"

আবু দাউদ শরীফে এ বিষয়ের অন্য একটি ঘটনা কায়েছ ইবনে সায়াদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি নিজে নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

আমি হীরা নামক স্থানে গিয়েছিলাম। (কুফার নিকটবর্তী একটি পুরাতান শহর) আমি ঐখানের মানুষকে তাদের নেতাগণকে সম্মান করার নিমিত্তে সিজদা করতে দেখেছি। আমি মনে মনে বললাম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিজদা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। তাঁকে আমাদের সিজদা করা চাই। পরে যখন আমি ভ্রমণ থেকে ফিরে হুযুরের খেদমতে

হাজির হলাম তখন এ কথাই আরয করলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ

✪ "বল আমার মৃত্যুর পর তুমি আমার কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় আমার কবরকে সিজদা করবে? (কায়েছ বললেন) আমি আরয করলাম, আপনার কবরকে সিজদা করব না। তখন তিনি বললেন, এখনও এটি করো না। অতঃপর তিনি এরশাদ করলেন, আমি যদি কাউকে আদেশ দিতাম অন্য কোন সৃষ্ট জীবকে সিজদা করার জন্য তবে মহিলাগণকে আদেশ দিতাম তাদের স্বামীগণকে সিজদা করার জন্য, স্বামীদের ঐ হক্কের জন্য যা আল্লাহ তায়ালা স্ত্রীগণের উপর নির্ধারিত করেছেন।"

মাসনাদে আহমদের মধ্যে হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একদা একটি উট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সিজদা করল। (অর্থাৎ হুযুরের সম্মুখে এমনভাবে ঝুকল দর্শকগণ বুঝতে পারল যেন উট সিজদা করছে।) ইহা দর্শনে কোন কোন সাহাবা আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল ! উটের ন্যায় চতুষ্পদ জন্তু এবং বৃক্ষ আপনাকে সিজদা করে (অর্থাৎ ঝুকে পড়ে) তাদের তুলনায় আমাদের কর্তব্য আপনাকে সিজদা করা। এর উত্তরে তিনি এরশাদ ফরমান ঃ

✪ "আপন প্রভুর ইবাদত কর এবং আপন ভাই (অর্থাৎ আমার)কে সম্মান কর। যদি আমি কাউকে আদেশ করতাম অন্য কোন সৃষ্ট জীবকে সিজদা করার জন্য তবে মহিলাকে নির্দেশ দিতাম নিজের স্বামীকে সিজদা করার জন্য।" এ সকল হাদীস এবং বর্ণনা থেকে বুঝা যায় স্ত্রীর উপর স্বামীর হক্ক সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে পুনঃ পুনঃ এরশাদ ফরমাইয়াছেন।

স্বামীর অনুগত হওয়া

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে এর প্রয়োজন ছিল উভয়ের মধ্যে একজনকে মুরুব্বী বা সর্দার নির্ধারণ করা। সেই হিসাবে তাকে কিছু দায়িত্ব

দেওয়া। ইহা প্রকাশ যে স্বাভাবিকভাবেই স্বামী এর উপযুক্ত। যেমন নাকি শরীয়তেও গৃহকর্তা স্বামীকেই নিরুপণ করেছে। এবং অনেক দায়িত্ব তার উপর সোপর্দ করেছে। যেমন এরশাদ হচ্ছে ঃ "পুরুষ মহিলাদের সর্দার এবং যিম্মাদার।"

মহিলাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে সে যেন বাড়ীর কর্তা এবং যিম্মাদার হিসাবে মান্য করে। স্ত্রী হিসাবে তার যে গৃহ দায়িত্ব আছে তাতে সে যেন অবহেলা না করে। যেমন তার সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

নেক স্ত্রীগণ স্বামীভক্ত হয় এবং স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্বামীর ইজ্জত ও আমানতের হিফাযত করে। যদি স্ত্রী স্বামীর অনুগত না হয় বরং অবাধ্য হয় এবং বিরোধিতার মনোভাব পোষণ করে তাহলে প্রথমে মনোমালিন্যতা পরে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হবে যা ইহকাল ও পরকাল ধ্বংশের কারণ হবে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাগণকে স্বামীর অনুগত এবং তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য কঠোর আদেশ দান করেছেন। এবং উহার জন্য ছাওয়াব এবং প্রতিদানের ঘোষণা দিয়ে উৎসাহিত করেছেন।

✪ হযরত আনাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে, যখন কোন মহিলা পাঁচ ওয়াক্তের নামায সঠিকভাবে আদায় করবে, রমযান মাসের রোযা রাখবে, লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে এবং স্বামীর অনুগত থাকবে, সে জান্নাতের যে কোন দরজা দিয়া চাইবে ঢুকতে পারবে। —হুলিয়া আবু নায়িম

ফায়েদা ঃ উক্ত হাদীসে এ কথাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে স্ত্রীগণের জন্য স্বামীগণের অনুগত থাকাকে নামায, রোযা এবং ব্যভিচার হতে নিজেকে রক্ষা করার সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। ইহা এদিকে ইঙ্গিত বহন করছে যে শরীয়তের দৃষ্টিতে উহার গুরুত্ব নামায, রোযার গুরুত্বের ন্যায়।

হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান যে মহিলা নিজের স্বামীকে সন্তুষ্ট এবং খুশী রেখে মৃত্যুবরণ করে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। —তিরমিযী

ফায়েদা ঃ যে সকল হাদীসে বিশেষ কোন আমলের উপর জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয় উহার উদ্দেশ্য হলো এই যে, এই আমলটি আল্লাহর নিকট প্রিয় এবং ইহার প্রতিদান জান্নাত এবং উহার আমলকারী জান্নাতী। কিন্তু যদি সেই আমল এমন কাজের সঙ্গে সংমিশ্রন ঘটে যার শাস্তি দোযখ তবে আল্লাহর কামনানুযায়ী উহার ফলও ভোগ করতে হবে। এভাবেই উম্মে ছালমার হাদীসের অর্থ বুঝতে হবে।

দ্বিতীয় কথা যা এখানে লক্ষ্যণীয়, যদি কোন স্বামী অন্যায়ভাবে স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট থাকে তবে স্ত্রী আল্লাহর নিকট নিরঅপরাধ বলে গণ্য হবে। এ পর্যন্ত ঐ সকল হাদীস বর্ননা করা হয়েছে যাতে স্ত্রীগণের উপর স্বামীগণের হক্কের উল্লেখ ছিল এবং তাদের অনুগত হওয়া, তাদের বাধ্য থাকা ও স্বামীগণের সদা সন্তুষ্টিলাভে সচেষ্ট হওয়ার আলোচনা ছিল। এখন ঐসকল হাদীস লক্ষ্য করেন যাতে স্বামীগণকে স্ত্রীগণের মন রক্ষা করা এবং তাদের সঙ্গে উত্তম পন্থা অবলম্বন করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শাসক ও অধীনস্তদের হক

শাসক বলতে বাদশাহ, তার নায়েব ও কর্মকর্তা ইত্যাদি এবং অধীনস্ত বলতে প্রজাসাধারণ ও চাকর নওকর ইত্যাদি শামিল। শাসকের দায়িত্ব হলো—

(১) অধীনস্ত তথা প্রজাসাধারণের উপর কোন অসাধ্য ও কঠিন নির্দেশ চাপাইয়া না দেওয়া।

(২) অধীনস্তদের মধ্যে কোন সমস্যা বা ঝগড়া-বিবাদ দেখা দিলে

পক্ষপাতিত্ব পরিহার করে ন্যায়সংগতভাবে তার মীমাংসা করে দেওয়া।

(৩) সর্বদিক থেকে তাদের শান্তি-শৃংখলা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা এবং বিচার প্রার্থী ও অভিযোগকারীদেরকে নির্বিঘ্নে তার সাথে সাক্ষাতের সুব্যবস্থা করা।

(৪) শাসকদের ব্যাপারে প্রজাদের কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে গেলে তা ক্ষমা করে দেওয়া।

শাসকের প্রতি অধীনস্তদের দায়িত্ব

(১) সর্বদা শাসকের মঙ্গল কামনা ও শরীয়তসম্মত কাজে তার আনুগত্য করতে থাকা।

(২) শাসক যদি স্বভাব বিরোধী কোন কাজ করে ফেলে তাহ্‌লে সমালোচনা বা বদদোআ না করে ধৈর্য ধারণ করা এবং তার মেযাজ শান্ত ও কোমল হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দোআ করতে থাকা এবং নিজেরা যথাযথভাবে আল্লাহ তাআলার অনুগত হয়ে থাকা। ফলে আল্লাহ তাআলাও শাসকের দেল নরম করে দিবেন। ইহা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

(৩) শাসকের উছিলায় শান্তি লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

(৪) ব্যক্তি স্বার্থের জন্য শাসকের সাথে বিদ্রোহ করা যাবে না। তাছাড়া দাসদাসীদের খোরপোশের ব্যবস্থা করা মালিকের দায়িত্ব। মালিককে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া দাসদাসীদের জন্য হারাম। অন্যান্য প্রজাসাধারণ স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে যতদিন থাকবে, ততদিনই কেবল দেশের আইন শৃঙ্খলা মেনে চলবে আর দেশ ছেড়ে চলে গেলে তার কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না এবং তখন সে দেশের শাসকের হক আদায় করতে হবে না।

শ্বশুরকুলের আত্মীয়দের হক

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বংশীয় সম্পর্কের সাথে সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, শ্বশুর-শাশুড়ী, শ্যালক, ভগ্নিপতি, জামাতা, বউমা এবং স্ত্রীর পূর্বেকার সন্তানের প্রতিও কিছুটা দায়িত্ব রয়েছে। তাই আচার-ব্যবহারে এদের ব্যাপারেও বিশেষত্ব থাকা চাই।

সাধারণ মুসলমানের হক

আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও সাধারণ মুসলমানদের প্রতি কিছু হক রয়েছে। প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ 'তারগীব ও তারহীব'এ হযরত আলী (রাঃ)র সূত্রে নিম্নোক্ত হকসমূহ বর্ণনা করেছেন।

(১) কোন মুসলমান ভাই কোন ভুল-ত্রুটি বা অন্যায় করলে মাফ করে দিবে।

(২) কোন মুসলমান ভাই বিপদগ্রস্ত হলে দয়া প্রদর্শন করবে।

(৩) দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে।

(৪) কোন মুসলমান কোন ওজর পেশ করলে বা মাফ চাইলে তা গ্রহণ করবে।

(৫) কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দেখলে তা মোচন করবে।

(৬) সর্বদা তার মঙ্গল কামনা করতে থাকবে।

(৭) সকল মুসলমানের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করবে।

(৮) তার দায়িত্বের প্রতি সচেতন ও যত্নবান থাকবে।

(৯) অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাবে।

(১০) মৃত্যুর পর জানাযায় উপস্থিত হবে।

(১১) দাওয়াত কবূল করবে।

(১২) হাদিয়া গ্রহণ করবে।

(১৩) উপকারের প্রতিদান দিবে।

(১৪) তার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে।

(১৫) সুযোগ পাইলে তার সাহায্য সহযোগিতা করবে।

(১৬) তার পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে।

(১৭) তার অভাব দূর করবে।

(১৮) কোন আবেদন পেশ করলে তা মঞ্জুর করবে।

(১৯) তার সুপারিশ গ্রহণ করবে।

(২০) তাকে কখনো কোন ব্যাপারে নৈরাশ করবে না।

(২১) হাঁচির জবাবে আলহামদুলিল্লাহ বললে প্রতিউত্তরে ইয়ার হামুকাল্লাহ বলবে।

(২২) কারো হারান বস্তু তার কাছে পৌঁছাইয়া দিবে।

(২৩) সালামের উত্তর দিবে।

(২৪) অত্যন্ত বিনয় ও নম্রভাবে কথা বলবে।

(২৫) তার সাথে সদ্ব্যবহার করবে।

(২৬) কোন ব্যাপারে কসম করলে তা পূরা করবে।

(২৭) কেউ তার উপর অত্যাচার করলে তাকে সাহায্য করবে এবং সে কারো উপর অত্যাচার করলে তাকে বাধা দিবে।

(২৮) তার সাথে ভালবাসা ও প্রেম প্রীতির সম্পর্ক রাখবে—শত্রুতা রাখবে না।

(২৯) কোন মুসলমানকে অপমান করবে না।

(৩০) নিজের জন্য যা পছন্দ করবে অন্য মুসলমানের জন্যও তা পছন্দ করবে।

অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে যে,

(৩১) সাক্ষাৎ হলে সালাম ও মোসাফাহা করবে।

(৩২) ঘটনাক্রমে কোন মনোমালিন্য হয়ে গেলে তিন দিনের অধিক কথা বন্ধ রাখবে না।

(৩৩) কারো ব্যাপারে খারাপ ধারণা রাখবে না।

(৩৪) কারো প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ রাখবে না। যথাসম্ভব সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে।

(৩৫) যথাসম্ভব সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ করতে থাকবে।

(৩৬) ছোটদেরকে স্নেহ ও বড়দেরকে সম্মান করবে।

(৩৭) দুই মুসলমানের মধ্যে ঝগড়া হলে পরস্পর আপোষ করে দিবে।

(৩৮) গীবত করবে না।

(৩৯) কারো জান-মাল এবং ইজ্জতের ক্ষতিসাধন করবে না।

(৪০) যানবাহনে আরোহন করতে না পারলে বা মালামাল উঠাতে না পারলে তাকে সাহায্য করবে।

(৪১) মজলিসে একজনকে সরাইয়া দিয়া তার স্থানে বসবে না।

(৪২) তৃতীয় ব্যক্তিকে সরিয়ে রেখে দুই জনে কানে কানে কথা বলবে না।

উল্লেখ্য যে, উপরে যাদের হকের কথা বলা হয়েছে তাহলো বিশেষ হক এবং সাধারণ হকসমূহ তাদের ব্যাপারেও প্রযোজ্য হবে।

প্রতিবেশীর হকসমূহ

সাধারণ মুসলমান ছাড়াও যারা আরও নিকটস্থ তাদের হক সাধারণ মানুষের তুলনায় একটু বেশী হবে। যেমন—প্রতিবেশী। এদের হক হলো-

(১) তাদের সাথে সর্বদা সদ্ব্যবহার করা।

(২) তাদের পরিবারবর্গের ইজ্জত ও মর্যাদা রক্ষা করে চলা।

(৩) মাঝে মধ্যে তাদের ঘরে কিছু হাদিয়া পাঠাতে থাকা। বিশেষতঃ প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত হলে খাদ্যের ব্যবস্থা করা।

(৪) তাদেরকে কষ্ট না দেওয়া এবং ছোটখাট ও সামান্য ব্যাপারে সমস্যা সৃষ্টি না করা। প্রতিবেশীর কষ্ট লাঘবের জন্যই শরীয়ত শোফআ' তথা প্রীএম্‌শনের (অন্যের পূর্বে ক্রয় করার অধিকার) নিয়ম চালু করেছে।

উলামাগণের অভিমত ঃ নিজ বাড়ীতে অবস্থান কালে যেমন কোন ব্যক্তির প্রতিবেশী থাকে তেমনি সফরেও প্রতিবেশী থাকে। অর্থাৎ সফরে যাত্রা করার সময় যারা সফরসঙ্গী রূপে সাথে আসে কিংবা পথিমধ্যে সঙ্গে যোগদান করে তারাও প্রতিবেশীর অন্তর্ভুক্ত। সফরের প্রতিবেশীর হক স্থানীয় প্রতিবেশীর হকেরই অনুরূপ।

সারকথা সফরসঙ্গীর আরাম আনন্দ ও শান্তিকে নিজের আরাম আনন্দের উপর প্রাধান্য দেওয়া। অনেকেই যানবাহনে চলাফেরা ও আরোহনের সময় অন্যের সাথে বাড়াবাড়ি করে ; এটা বড়ই খারাপ। এ ধরনের কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা দরকার।

এতিম ও অসহায়দের হক

যারা পরনির্ভরশীল, যেমন এতিম, বিধবা, অসহায়, দুর্বল, রুগ্ন, পঙ্গু ইত্যাদি। এদেরও অতিরিক্ত কিছু হক রয়েছে। যেমন—

(১) তাদের আর্থিক সহযোগিতা করা।

(২) নিজে খাটিয়া তাদের কাজ করে দেওয়া।

(৩) বিপদাপদে তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া ও

(৪) কোন কিছু প্রার্থনা করলে তাদেরকে বিমুখ না করা।

মেহমানের হক

মেহমানেরও কিছু হক আছে। যেমন—

(১) মেহমান আসার মুহূর্তে আনন্দ প্রকাশ করা এবং বিদায়কালে অন্ততঃপক্ষে বাড়ির গেইট পর্যন্ত আগাইয়া দেওয়া।

(২) নিত্যপ্রয়োজনীয় সামান পত্রের ব্যবস্থা করে তার আরামের ব্যবস্থা করে দেওয়া।

(৩) মেহমানের সামনে বিনয়-নম্রতা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা এমনকি নিজ হাতে তার সেবা করা।

(৪) অন্ততঃপক্ষে একদিন তার জন্য এতটুকু উত্তম আহারের ব্যবস্থা করা যাতে নিজেরও তেমন পেরেশানী ভোগ করতে না হয় এবং মেহমানও লজ্জিত না হয় এবং কমপক্ষে তিনদিন যাবত সাধারণ মেহমানদারী করা। এতটুকু তার প্রাপ্য হক। অতঃপর মেযবানের যতদিন সম্ভব মেহমানদারী করবে। তবে মেহমানের কর্তব্য হলো বেশী দিন অবস্থান করে কিংবা অন্য কোন প্রকারে মেযবানকে বেকায়দায় না ফেলা। থাকা খাওয়া ও ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কোন ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করা মেহমানের জন্য উচিত নয়।

বন্ধু-বান্ধবের হক

অনুরূপভাবে যাদের সাথে বিশেষ বন্ধুত্ব রয়েছে পবিত্র কুরআনে তাকেও আত্মীয়-স্বজনের সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। তার হক হলো—

(১) কারো সাথে বন্ধুত্ব করতে হলে প্রথমে তার আকীদা বিশ্বাস ও আমল-আখলাক ভালভাবে যাচাই করে নিবে। যদি সবদিক দিয়া সে উপযুক্ত হয় ; তবে তার সাথে বন্ধুত্ব গড়বে অন্যথায় এমন লোকদের সঙ্গ ত্যাগ করা জরুরী। অসৎসঙ্গ থেকে দূরে থাকার ব্যাপারে জোর তাকিদ দেওয়া হয়েছে। সমপর্যায়ের চরিত্রবান লোকের সাথে বন্ধুত্ব করলে কোন অসুবিধা হয় না। বরং এমন বন্ধুত্বই দুনিয়ার চাইতে বড় আরামের বস্তু।

(২) জান-মাল সবকিছু দিয়া উপকার করতে ত্রুটি করবে না।

(৩) বন্ধুর নিকট থেকে তোমার স্বভাব বিরোধী কোন আচরণ হয়ে গেলে তা ক্ষমা করে দিবে। ঘটনাক্রমে যদি কখনো বন্ধুর সাথে মনোমালিন্য হয়ে যায় তাহলে তার সমাধা করে নিতে বিলম্ব করবে না। বন্ধুর সাথে হাসি-গল্প করা বড়ই আনন্দদায়ক। তাই বলে সর্বদা তা নিয়া ব্যস্ত থাকবে না।

(৪) বন্ধুর মঙ্গল কামনায় কোন প্রকার ত্রুটি করবে না। তাকে সৎপরামর্শ দিবে এবং তার সৎপরামর্শ গুরুত্বের সাথে শুনবে। যদি তা গ্রহণযোগ্য হয় তবে গ্রহণ করবে।

উল্লেখ্য যে, এই উপমহাদেশে পালক সন্তানকে সর্বক্ষেত্রেই ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় মনে করা হয় ; শরীয়তে ইহার কোন ভিত্তি নাই। বস্তুতঃ পালক সন্তান বা মুখডাকা সন্তানের হক বন্ধুদের চেয়ে বেশী নয়। বড়জোর একে বন্ধুত্বের পর্যায়ে রাখা যায়। পালক সন্তানেরাও সহায় সম্পত্তি কোন কিছুরই উত্তরাধিকারী হবে না। মনে রাখতে হবে সম্পদ বন্টনের শরীয়ত

যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছে তার ব্যতিক্রম করার অধিকার কারো নাই। যাকে ইচ্ছা দিবে আর যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত করবে এ অধিকার কারো নাই।

নিজের উপর আরোপিত হকসমূহ

যেসব অধিকারের কথা আলোচনা করা হলো তা পালন করা পূর্ব থেকেই মানুষের যিম্মায় জরুরী। তা ছাড়া এমন কিছু হকও আছে যা মানুষ নিজেই নিজেই উপর চাপিয়ে নেয়। তন্মধ্যে কিছু হলো আল্লাহর হক, যা তিন প্রকার—

প্রথম প্রকার— এমন সব হক যা ইবাদত বন্দেগী হওয়ার কারণেই মানুষের উপর অর্পিত হয়। যেমন, কোন মাকসুদ পূর্ণ হওয়ার জন্য মান্নত করা, কোন উদ্দেশ্যমূলক এবাদতের জন্য মান্নত করলে তা পূরা করা ওয়াজিব। আর উদ্দেশ্যমূলক ইবাদতের মান্নত না হলে তা পূরা করা মুস্তাহাব। আর যদি শরীয়ত অনুমোদিত কোন কাজের মান্নত হয় তাহলে এই ধরনের মান্নত করলে তা পূরা করা হারাম ও নিষিদ্ধ। আল্লাহ তাআলা ছাড়া অন্য কারো জন্য মান্নত করা সম্পূর্ণ হারাম।

দ্বিতীয় প্রকার— যেসব হকের কারণ শরীয়ত অনুমোদিত কোন জিনিষ হয়ে থাকে যেমন কোন কোন জায়েয কসমের কাফফারা বা মুসাফির ও রুগীর রমযানের রোযা কাযা করা ইত্যাদি এই ধরনের হক আদায় করা অবশ্য কর্তব্য।

তৃতীয় প্রকার— যেসব হক গুনাহের কারণে মানুষের উপর আরোপিত হয় যেমন ঃ কারণ ছাড়া রমযানের রোযা ভেঙ্গে ফেলা। ভুলবশতঃ কাহাকেও হত্যা করার কারণে অথবা নিজের স্ত্রীকে মার সাথে তুলনা করার কারণে সে ব্যক্তির উপর যে শাস্তি ওয়াজিব হয়। এ ধরনের হকগুলো আদায় করা ওয়াজিব।

এতে বুঝা গেল যে,মৃত্যুর সময় বিশেষ কোন সন্তানকে সম্পদ না দেওয়ার অসিয়ত করার যে প্রচলন রয়েছে তা সম্পূর্ণ শরীয়তের ব্যতিক্রম।

অমুসলমানদের হক

আত্মীয় বা মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র মানুষ হওয়ার কারণে অমুসলমানদেরও কিছু হক আছে। তাহলো—

(১) নিরপরাধ কোন অমুসলমানকে দৈহিক বা আর্থিক কোনপ্রকার কষ্ট দিবে না।

(২) শরীয়ত সমর্থিত কারণ ছাড়া কোন অমুসলমানের সাথে কটু কথা বলবে না।

(৩) কোন অমুসলিম বিপদগ্রস্ত হলে তাকে সাহায্য করবে। ক্ষুধার্ত হলে খাদ্য দিবে আর অসুস্থ হলে চিকিৎসার ব্যবস্থা করবে।

(৪) শরীয়ত সমর্থিত শাস্তি দিতে হলে কোনপ্রকার জুলুম বা সীমা লংঘন করবে না। তাদের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করবে।

পশু-পাখির হকসমূহ

পশু-পাখির হক হলো— (১) যুক্তিসংগত প্রয়োজন ছাড়া এদেরকে আটকাইয়া রাখবে না। বিশেষতঃ বাচ্চাদেরকে বাহির করে আনা এবং তাদের মা-বাপকে পেরেশান করা বড়ই নির্দয়তা।

(২) যেসব প্রাণী মানুষের উপকারে আসে তাদেরকে অনর্থক হত্যা করবে না।

(৩) যেসব প্রাণী কাজে নিয়োজিত তাদেরকে নিয়মিত আহার দিবে

এবং তাদের আরামের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রাখবে এবং তাদের দ্বারা সামর্থ্যের অতিরিক্ত কাজ নিবে না।

(৪) কোন জানোয়ার জবেহ করতে হলে কিংবা কষ্টদায়ক হওয়ার দরুণ হত্যা করতে হলে ধারালো অস্ত্র দ্বারা শান্ত-শিষ্ট ভাবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সেরে ফেলবে। ভুখা রেখে কিংবা কষ্ট দিয়ে সেগুলোকে মারা বা জবেহ করা যাবে না।

যেসব হক মানুষ নিজের উপর ইচ্ছাকৃতভাবে চাপাইয়া লয় এবং যেগুলো বান্দার হকের শামিল সেগুলোও তিন প্রকার—

প্রথম প্রকার— যেসব হক এবাদত হওয়ার কারণেই জরুরী হয়েছে যেমন—ওয়াদা করলে তা যথাযথ পালন করা। হাদীস শরীফে ওয়াদা ভঙ্গ করাকে মুনাফেকের আলামত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার— যেসব হক শরীয়ত অনুমোদিত কোন বস্তু হওয়ার কারণেই জরুরী হয়েছে যেমন— ঋণানুযায়ী জিনিস আদায় করা। বিক্রিত মাল ক্রেতার হাতে হাতে তুলে দেওয়া। বিবাহিতা মহিলাকে স্বামীর নিকট অর্পণ করা, মহরের ঋণ পরিশোধ করা, শ্রমিক মজুরের পারিশ্রমিক আদায় করা। আমানত প্রকৃত মালিকের নিকট পৌঁছাইয়া দেওয়া ইত্যাদি। এসব আদায় করা ওয়াজিব।

তৃতীয় প্রকার— যেসব হক গোনাহের কারণে মানুষের উপর অর্পিত হয়। যেমন কাহাকেও হত্যা করা, কারো ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা, চুরি-ডাকাতি করা, আমানতের খেয়ানত করা, গীবত করা, পরনিন্দা করা, কাহাকেও গালি দেওয়া এ ধরনের হক মাফ নিতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে মাফ চাইতে হবে অন্যথায় পরকালে কঠিন আযাব ভোগ করতে হবে।

উপসংহার

বান্দার উপর আল্লাহ্ তাআলার যেইসব হক অর্পিত হয় যদি এগুলো ইবাদত সম্পর্কীয় হয় তবে সেগুলো যথাযথভাবে আদায় করবে যেমন— নামায, রোযা, যাকাত ইত্যাদি। এখনই আদায় করার মত সুযোগ না থাকলে সুযোগ হওয়ামাত্রই আদায় করবে। এতে কোনপ্রকার অলসতা বা অসতর্কতা অবলম্বন করবে না। আর যদি এগুলো কোন গোনাহ সম্পর্কীত হয় তাহলে আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চাইবে। আল্লাহতাআলা মাফ করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

আর যদি বান্দার হক হয় তাহলে সম্ভব হলে আদায় করবে না হয় মাফ করিয়ে নিবে। যেমন—ঋণ বা গচ্ছিত আত্মসাৎ করা সম্পদ ইত্যাদি। আর যদি আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে শুধু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট মাফ চেয়ে নিবে যেমন—গীবত করা, পরনিন্দা করা।

আর যদি যুক্তিসঙ্গত কারণবশতঃ হক আদায় করার বা ক্ষমা প্রার্থনা করার সুযোগ না থাকে তবে সর্বদা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গোনাহ মাফের জন্য আল্লাহর দরবারে দোআ করতে থাকবে। আল্লাহ তাআলা হয়ত পরকালে এদেরকে খুশী করে দিবেন এবং ইহারাও খুশী হয়ে তোমাকে মাফ করে দিবে। যতক্ষণ আদায় করার বা দোআ করার শক্তি থাকে ততক্ষণ দোআ করতে বা আদায় করতে কোন প্রকার ত্রুটি করবে না। যদি নিজের কোন হক অন্যের কাছে পাওনা থাকে এবং সে ব্যক্তির পক্ষে আদায় কার সম্ভব হয় তবে নম্র ও ভদ্র ভাষায় চেয়ে নিবে। আর যদি হক পাওয়ার আশা না থাকে বা আদায় যোগ্য না হয় (যেমন গীবত ইত্যাদি) তাহলে পরকালে এর বিনিময়ে অনেক সওয়াবের অধিকারী হবে এবং ক্ষমা করাও সর্বোত্তম। বিশেষ করে যারা ক্ষমাপ্রার্থী হয় এদেরকে অবশ্যই ক্ষমা করে দিবে।

সমাপ্ত

اِزَالَةُ الرَّيْنِ عَنْ حُقُوْقِ الْوَالِدَيْنِ

হুকূকুল ওয়ালিদাইন

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

হামদ ও সালাতের পর,

ইসলাম প্রিয় ভাই-বন্ধুগণের সমীপে লেখকের আরজ এই যে, বহু দিন যাবৎ পরিলক্ষিত হচ্ছে যে, অনেকেই মাতাপিতার হক আদায়ের ব্যাপারে এত বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলে যে, যদ্দ্বারা অন্যান্য হকদারদের হক বিনষ্ট করে আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত হয়। এবং এ কাজকে উত্তম মনে করে তারা বলে যে, মাতাপিতার অনুগত হতে ইসলাম আমাদেরকে এ ধরনের শিক্ষাই দিয়েছে। তাদের বক্রবিবেচনার স্বপক্ষে তারা কুরআন-হাদীসের প্রমাণাদীও পেশ করে থাকে। তাদের এ অশোভনীয় আচরণে অন্তর ব্যথায় ব্যথাতুর হয়ে উঠে।

মহান রাব্বুল আলামীনের অপার কৃপায় এ ব্যাপারে একটি পুস্তিকা রচনার আগ্রহ জন্মে, পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে পুস্তিকাটির শুভ সমাপ্তি এবং সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য দোআ করি।

বইটির শেষাংশে একটি জরুরী পরিশিষ্ট সংযোজিত হবে, যাতে স্বামী-স্ত্রী ও উস্তাদের হকের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত করণের বর্ণনার পর তার সঠিক দিক নির্দেশনা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হবে।

উপরে বর্ণিত বিষয়ই হলো পুস্তিকাটির মূল উদ্দেশ্য তথাপি আরো অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ও এতে বর্ণিত হবে। আমাদেরকে এ কথা স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে স্বীয় বন্দেগী ও দাসত্বের

জন্য সৃষ্টি করেছেন। আমাদেরও সার্বক্ষণিক ও সর্বোতোভাবে সেই মহান সৃষ্টিকর্তারই আনুগত্য স্বীকার করা অপরিহার্য। আর অন্যান্যদের আনুগত্য যা আল্লাহ তাআলা আমাদের জন্য আবশ্যকীয় করে দিয়েছেন তা হবে শুধুমাত্র এর তাবে ও অনুগত হিসাবে। আর এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে, সর্বদা অধীন এবং উদ্দেশ্য কারণের উপর প্রাধান্য পাবে। যদি উসিলা বা মাধ্যম এবং নকল বা শাখা জিনিসের আনুগত্য করতে গিয়ে আসল উদ্দেশ্যের আনুগত্যে বিঘ্ন সৃষ্টি হয় তাহলে তেমন আনুগত্য দোষণীয় ও অবৈধ। যা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দলীল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। মূল জিনিস শাখা হওয়া এবং শাখা-জিনিস মূল বা আসল হওয়া আবশ্যকীয় হবে যা স্বভাববিরুদ্ধ, প্রত্যাখ্যাত, উদ্দেশ্য বহির্ভূত।

সুতরাং উক্ত যুক্তির নিরিখে কুরআন ও হাদীসের আলোকে আসল উদ্দেশ্যকে প্রমাণিত করা হবে। গভীর চিন্তা ও বিবেচনা দ্বারা বুঝতে চেষ্টা করুন। এ পুস্তিকাটি বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলেরই ভ্রান্তি নিরসনে যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে। ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন।

وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَيَهْدِى السَّبِيْلَ ۔ اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۔

প্রারম্ভিকা

وَقَضٰى رَبُّكَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ۔ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ اِنْ تَكُوْنُوْا صَالِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا ۔

অর্থ ঃ তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাকে ছাড়া আর কারো এবাদত করো না, এবং পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয় তবে তাদেরকে 'উহ' শব্দটিও বলো না।

এখানে বার্ধক্যের শর্ত আরোপ করার উদ্দেশ্য হলো গুরুত্ব বুঝানোর জন্য। কেননা সে অবস্থায় সম্মান প্রদর্শনই বেশী প্রযোজ্য। তদুপরি সে অবস্থায় তারা খেদমতেরও অধিক মুখাপেক্ষী হয় এবং তখন সন্তান অধিক দয়ার্দ্রতাবশতঃ ক্রোধান্বিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। নতুবা বার্ধক্যে উপনীত না হলেও তখনকার জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য।

সূরা লুকমানের আয়াত— وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا -

(এবং দুনিয়াতে তাদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করে চল) প্রমাণ করে যে, এ আদেশটি শর্তাধীন নয় বরং ব্যাপক। কারণ, মা-বাপকে কষ্ট দেয়া আদিষ্ট সদ্ব্যবহারের পরিপন্থী। আর বৃদ্ধ বয়সে মা-বাপের সঙ্গে যে শব্দ ব্যবহার করা হারাম করা হয়েছে তা কষ্ট প্রদানের শামিল। সুতরাং মা-বাপকে 'উফ' বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না, সম্মানের সঙ্গে কথা বলো, তাদের সামনে বিনয়ের ডানা বিছিয়ে দাও (অর্থাৎ বিনয় প্রদর্শন কর) এবং এ দুআ কর যে, হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি তুমি রহম কর যেমন আমাকে তারা ছোটবেলায় লালন-পালন করেছে। তোমাদের অন্তরে কি আছে, তোমাদের রব তা ভালো করেই জানেন। (অর্থাৎ তোমরা নিজের সৌভাগ্য মনে করে মাতাপিতার খেদমত করছ, নাকি বোঝা মনে করে তা আল্লাহ তাআলার ভালো করেই জানা আছে তবে যদি সৌভাগ্য মনে করে নেক নিয়তেই তা কর আর কখনো রাগের মাথায় কোন অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বস এবং পরে আমার কাছে তাওবা করে নাও ও সম্ভব হলে তাদের কাছেও মাফ চেয়ে নাও ; তাহলে আমি তা ক্ষমা করে দেব। আর যদি তাদের কাছে মাফ চাওয়া সম্ভব না হয় ; তাহলে তাদের জন্য বেশী করে গোনাহ মাফের দোআ করতে থাক ; কিয়ামতের দিন মাফ করে দেব।)

আত্মীয়-স্বজন অসহায় এবং মুসাফিরকে তাদের হক প্রদান কর। (আল্লাহ তাআলা ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য মাতাপিতার হকের সাথে সাথে অন্যদের হক আদায় করাও ফরয করে দিয়েছেন। কারণ, এত গুরুত্ব সহকারে মাতাপিতার আনুগত্যের আদেশ দেখে কেউ অন্য কারো হক আদায় করাকে সাধারণ বিষয় মনে করে তাতে অবহেলা করারও মাতাপিতার সন্তোষকে অগ্রাধিকার দেয়ার সম্ভাবনা ছিল। যেমন ঃ মা-বাপ বলত যে, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনকে কষ্ট দাও। ওয়াজিব পরিমাণ ভরণ-পোষণে ঘাটতি কর ; তাহলে মাতাপিতার আদেশ পালনার্থে সে তা করতে শুরু করত। এ কারণে পরম দয়ালু আল্লাহ পাক এ কথা বলে দিয়েছেন যে, সবকিছুরই একটা সীমা আছে। মাতাপিতার কারণে অন্য কারো হক নষ্ট করা যাবে না। আপন আপন স্থানে প্রত্যেকেরই হক আদায় করতে হবে।)

ফায়েদা ঃ এ আয়াত দ্বারা মা-বাপকে 'উফ' বলতে নিষেধ করা হয়েছে। শুধু এ শব্দই নয় বরং যেসব আচরণ ও উচ্চারণ দ্বারা মাতাপিতার মনে কষ্ট আসে তাই এ নিষেধের অন্তর্ভুক্ত। ফেকাহবিদগণ উল্লেখ করেছেন যে, 'উফ' শব্দটি উচ্চারণ করা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হলো, এতে মাতাপিতার মনে কষ্ট আসে। অর্থাৎ—এ 'উফ' শব্দ এবং এ ধরণের অন্য যে শব্দ দ্বারা মা-বাপের মনে কষ্ট আসে তাই নিষিদ্ধ।

মোটকথা, মূল বিধান হলো, যে সব আচরণ বা উচ্চারণ দ্বারা মাতাপিতার কষ্ট হয়, তাদের সঙ্গে তা ব্যবহার করা সন্তানের জন্য নিষিদ্ধ ও হারাম আর যেসব আচরণে কষ্ট না হয় তা নিষিদ্ধ নয়। সর্বক্ষেত্রে এ কারণ ও বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। এ কারণটিই সব বিধানের মূল ভিত্তি। এ উফ শব্দ বা এ ধরনের অন্য কোন শব্দ যদি কোন সম্প্রদায়ে সম্মানার্থে ব্যবহৃত হওয়ার নিয়ম থাকে ; তাহলে মা-বাপের বেলায় তা ব্যবহার করার অনুমতি থাকবে।

যেসব বিষয়ে মাতাপিতার আদেশ পালন করা জরুরী নয়

(১) যে সফর এমন হয় যাতে প্রাণহানির প্রবল আশংকা নেই (ব্যবসা, হজ্জ ইত্যাদির সফর যদি তা ফরয বা ওয়াজিব না হয়) ; মাতাপিতার অনুমতি ছাড়াই সে সফর জায়েয আছে। মাতাপিতা সে সফর করতে নিষেধ করলে তাদের কথায় সফর বর্জন করা জরুরী নয়। দুররে মুখতার ও আলমগীরীতে এ মাসআলা উল্লেখ রয়েছে। আর যে সফর ফরয বা ওয়াজিব তাতে মা-বাপের নিষেধাজ্ঞা পালন করার তো প্রশ্নই আসে না। এ বিধান সে অবস্থার জন্য প্রযোজ্য যখন মা-বাপের জরুরী খেদমতের প্রয়োজন না থাকে। হয়ত আদৌ খেদমতের প্রয়োজন নেই অথবা প্রয়োজন আছে কিন্তু খেদমত করার মত অন্য লোক আছে। কারণ, উপরোক্ত দুটি সূরতে মাতাপিতার কোন কষ্ট বা অসুবিধা হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিধায় এ দু সূরতে মাতাপিতার মতের বিরুদ্ধে কাজ করা জায়েয—হারামও নয় মাকরূহও নয়।

(২) মা-বাপের যদি আবশ্যকীয় প্রয়োজনের জন্য (যাকে শরীয়ত আবশ্যক সাব্যস্ত করেছে যেমন ঃ খাদ্য, পোশাক, ঋণ পরিশোধ) অর্থের প্রয়োজন না হয় এবং সন্তানের কাছে নিজের জরুরী হাজতের চেয়ে বেশী অর্থ-সম্পদ থাকে আর মা-বাপ সন্তানের কাছে অর্থ-সম্পদ তলব করে ; তাহলে এমতাবস্থায় মা-বাপকে অর্থ-সম্পদ দেয়া সন্তানের জন্য জরুরী নয়।

(৩) মা-বাপ যদি খেদমতের প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও নফল ইবাদত করতে নিষেধ করে বা অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় কাজ করতে নিষেধ করে, তাহলে সন্তানের জন্য তাদের কথা মানা জরুরী নয়। তবে যদি মা-বাপের

খেদমতের প্রয়োজন থাকে এবং খেদমত করার মত অন্য লোকও নেই, আর নফল ইবাদত করতে গেলে মা-বাপের কষ্ট হয় ;তাহলে নফল ত্যাগ করে মা-বাপের খেদমত করা সন্তানের জন্য ওয়াজিব।

(৪) মাতাপিতা যদি হুক্কা (বা অন্য কোন ধূম) পানে অভ্যস্ত হয় তা আর তা কোন রোগ বা অন্য কোন উযরের কারণে না হয় ; আর মা-বাপ হুক্কা প্রস্তুত করে দেয়ার হুকুম করে (হুক্কা পান করা মারাত্মক মাকরূহে তানযিহী। তবে যদি বিশেষ কোন হুক্কা হয় এবং তদ্দ্বারা কোন ক্ষতি বা মুখে দুর্গন্ধ হওয়ার আশংকা না থাকে কিংবা এমন কোন রোগ হয়, হুক্কা ব্যতীত অন্য কোন ঔষধ দ্বারা যার নিরাময় অসম্ভব হয় ; তাহলে তা জায়েয আছে। মাজালিসুল আবরার প্রণেতা অত্যন্ত তাহকীক ও তাফসীলের সাথে হুক্কার অপকারিতা প্রমাণ করেছেন) এমতাবস্থায় তাদের আদেশ পালন করা সন্তানের জন্য জরুরী নয় বরং একটি মাকরূহ কাজে লিপ্ত হওয়ার শামিল, শরীয়াতে যা নিন্দনীয়। আর প্রয়োজনের অবস্থায়, যার তাফসীল উপরে বলা হয়েছে ; তাদের আদেশ পালন করা ওয়াজিব।

(৫) যদি কারো স্ত্রীর আচরণে তার মা-বাপের কোন কষ্ট ও অসুবিধা না হয়, এমতাবস্থায় মা-বাপ যদি তাকে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়ার আদেশ করে ; তাহলে মা-বাপের এ আদেশ পালন করা সন্তানের উপর জরুরী নয়। বরং এক্ষেত্রে তালাক দেয়া স্ত্রীর উপর এক ধরনের জুলুম। তালাক আল্লাহ তাআলার নিকট বড়ই অপছন্দনীয় জিনিস। একান্ত নিরূপায় অবস্থার জন্যই তা জায়েয রাখা হয়েছে। অযথা তালাক দেয়া জুলুম ও মাকরূহে তাহরিমী। সম্পর্ক গড়ার জন্যই তো বিবাহ। সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এ সম্পর্ক ছিন্ন করা জায়েয হতে পারে না।

(৬) মা-বাপ যদি কোন গুনাহের কাজ করার আদেশ দেয় যে, তুমি

অমুক গুনাহ কর। যেমন ঃ বলল যে, হকপন্থীদের সাহায্য সহযোগিতা করো না, যাকাত দিও না কিংবা দ্বীনি শিক্ষা অর্জন করো না ইত্যাদি। তাহলে মা-বাপের কথা মানা হারাম এবং তার বিরুদ্ধাচারণ করা ফরয। তবে যদি তাদের সত্যিই কোন কষ্ট হয়, যেমন ঃ তারা অসুস্থ। খেদমত করার কেউ নেই। নামাযেরও সময় যদি তাদের দেখাশুনা করা না হয়, তাহলে মারাত্মক ক্ষতির আশংকা রয়েছে ; এমতাবস্থায় যদি তারা নামায কাযা করতে বলে, তাহলে কাযা করবে। পরে কোন এক সময় কাযা পড়ে নিবে। আর যদি নিজেদের (বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য) কোন জরুরী প্রয়োজনের জন্য মুস্তাহাব কাজ করতে বাধা দেয় ; তাহলে তাদের হুকুম তামীল করা ওয়াজিব। কিন্তু অযথা বাধা দিলে ওয়াজিব নয়।

(৭) মা-বাপ যদি বলে যে, তুমি আমাদের অমুক সন্তানকে (যে অভাবী নয়) এত টাকা দিয়ে দাও, তাহলে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তা দেয়া ওয়াজিব নয়।

এ যাবত এ কথাই বলা হলো যে, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে মাতাপিতার আদেশ পালন করা ওয়াজিব আর কোথায় নিষিদ্ধ এবং কোথায় জায়েয। মোটকথা, সর্বক্ষেত্রে মা-বাপের আনুগত্য জরুরী নয়।

মা-বাপের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করার সঠিক অর্থ

মা-বাপের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা নামায, রোযা, হজ্জ, উমরা ও আল্লাহর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা উত্তম হওয়া সংক্রান্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। একে হাদীস বলাও জায়েয নাই। ইমাম শাওকানী (রহঃ) ফাওয়ায়েদে মাজমুআয় এ কথাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করেছেন। তদুপরি এ বক্তব্য শরয়ী নীতিমালারও পরিপন্থী। এ ব্যাপারে সামনে আলোচনা করা হবে।

মিশকাত শরীফে 'আলবির ওয়াসসিলাহ' অধ্যায়ে তিরমিযী শরীফের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি মাতাপিতার সন্তুষ্টির উপর নির্ভরশীল। (অর্থাৎ মাতাপিতা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট আর মাতাপিতা অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তাআলাও অসন্তুষ্ট)

ফায়েদা ঃ এ হাদীস থেকে এ ধারণা সৃষ্টি হয় যে, সব কাজই মা-বাপের খুশীমত করতে হবে। অন্যথায় গুনাহগার হতে হবে। অথচ ব্যাপারটি এমন নয়। তাই হাদীসে তাৎপর্য এই হবে যে, যেসব ব্যাপারে মা-বাপের আনুগত্য করতে শরীয়াত নির্দেশ দিয়েছে সেসব বিষয়ে কোন ত্রুটি হলে আল্লাহ তাআলা অসন্তুষ্ট হন সন্তানকে নাফরমান তখনই বলা যাবে যখন সে মা-বাপে জরুরী হক আদায় না করবে। অতএব এ বিধানটি শর্তমুক্ত নয় বরং প্রথমে যে রীতি স্থির করা হয়েছিল তারই অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ যে কাজ করলে মাতাপিতার কষ্ট হয় তা করা ওয়াজিব।

বলা বাহুল্য যে, সন্তান ও স্ত্রীকে যদি সর্বক্ষেত্রে মাতাপিতা ও স্বামীর আনুগত্য করার আদেশ দেয়া হতো, তাহলে বহু লোক মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআলার ইবাদত বন্দেগী থেকেই বঞ্চিত হয়ে যেত এবং প্রকৃত মাহবূবের স্মরণ ও তার যিকিরের আসল স্বাদ ও উচ্চ মর্যাদা হতে মাহরূম রয়ে যেত।

মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য

আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ.

মানুষ ও জিন জাতিকে আমি কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।

আর হাদীসে কুদসীতে বলা হয়েছে ঃ

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَاَحْبَبْتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

অর্থাৎ আমি লুকায়িত ভাণ্ডার ছিলাম। অতঃপর আত্মপ্রকাশের বাসনা জাগলে আমি মাখলুক সৃষ্টি করি।

এতে প্রমাণিত হলো, ইবাদতে ইলাহী এবং মারেফতে মাহবূবই সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য। তাই সর্বক্ষেত্রে একে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

মা-বাপের আদেশে নিজের স্ত্রীকে তালাক দিবে কিনা

হযরত আবুদ্দারদা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমার স্ত্রী আছে। তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমার মা আমাকে আদেশ করছেন। (তাকে আমি তালাক দেব কি?) উত্তরে তিনি বললেন, আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, বাপ (এবং মা) বেহেশতের সর্বোত্তম দরজা। এবার তোমার ইচ্ছা হলে দরজা সংরক্ষণ করতে পার, নষ্টও করতে পার। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

বলা বাহুল্য যে, উক্ত লোকটির স্ত্রীর দ্বারা তার মায়ের সত্যিই কষ্ট হতো। তাই সে তালাক দেয়ার আদেশ করে। অন্যথায় অযথা তালাক দেয়ানো জুলুম এবং জুলুমের কাজে সাহায্য করাও জুলুম।

অনুরূপভাবে হযরত উমর (রাযিঃ)ও তাঁর ছেলেকে তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কথা বলেন। কিন্তু ছেলে তাতে রাজী ছিলেন না। ফলে তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাকদিতে বলে দেন।

উল্লেখ্য যে, হযরত উমর (রাযিঃ)এর ন্যায় এক মকবূল সাহাবী কারো জুলুম করতে পারেন না। কথার কথা যদি করতেনও তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে তালাক দেয়ার পক্ষে কথা বলে জুলুমের সহায়তা করতেন কিভাবে? এখানেও ঠিক একই কথা যে, ইবনে উমরের স্ত্রীর দ্বারা তাঁর মা-বাপের কষ্ট হতো। তাই তাকে তালাক দেয়ার কথা বলেছেন।

মা-বাপের হক আদায়ে জান্নাতের সুসংবাদ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, মা-বাপের (জরুরী হক আদায় করার ব্যাপারে সে আল্লাহ তাআলার অনুগত, তাহলে সে এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, জান্নাতের দুটি দরজা তার জন্য উন্মুক্ত। আর যদি মা-বাপের একজন জীবিত থাকে এবং তার সঙ্গে অনুরূপ আচরণ করা হয়; তাহলে তারজন্য জান্নাতের একটি দরজা উন্মুক্ত। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় প্রভাত করে যে, সে মা-বাপের জরুরী হক আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলার অবাধ্য, তাহলে জাহান্নামের দুটি দরজা তার জন্য খুলে যায়। আর যদি মা-বাপের একজন বেঁচে থাকে তাহলে একটি দরজা খুলে যায়।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী শুনে এক ব্যক্তি বলল, মা-বাপ যদি সন্তানের উপর জুলুম করে তবুও কি তাদের আনুগত্য করতে হবে? উত্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার বললেন, যদিও মা-বাপ সন্তানের উপর জুলুম করে তবুও তাদের আনুগত্য করে যেতে হবে। অর্থ্যা মা-বাপের যেসব হক আদায় করা

সন্তানের উপর জরুরী, মা-বাপ জুলুম করলেও তা আদায় করার ব্যাপারে ত্রুটি করা যাবে না যে, তারা যখন আমার উপর জুলুম করছে আমিও তাদের সঙ্গে তাই করব।

আল্লাহ তাআলার নাফরমানীর জন্য কারো আদেশ মানা যাবে না

আমার উপরোক্ত আলোচনার অর্থ এই নয় যে, মা-বাপ এমন কোন কাজ করার আদেশ করবে যা শরীয়তের আইনে জুলুম আর তাতে তাদের আদেশ পালন করবে। কারণ হাদীসে আছে যে,

لَا طَاعَةَ مَخْلُوْقٍ فِىْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

অথাৎ, সৃষ্টির কোন প্রকার আইন পালন করা, যা স্রষ্টার আইনের পরিপন্থী ; কিছুতেই বৈধ নয়। আরবী ভাষা রীতি অনুযায়ী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রমাণিত হলো যে, কোন মাখলুকের এমন কোন কথা মানা যাতে আল্লাহর নাফরমানী হয়, তা কিছুতেই জায়েয নেই।

মা-বাপের ভরণ-পোষণ কখন ওয়াজিব হয়

স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ব্যতীত অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ একজন লোকের জিম্মায় তখনই ওয়াজিব হয় ; যখন সে এতটুকু সম্পদের মালিক হয়, যাতে সদকা-ফিতর ওয়াজিব হয়। মা-বাপও এ আইনের আওতাভুক্ত। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ সর্বাবস্থায়ই স্বামীর উপর ওয়াজিব। চাই গরীব হোক বা ধনী। এতে প্রমাণিত হলো যে, উক্ত পরিমাণ সম্পদ না থাকলে মাতাপিতার ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হবে না। তবে আমার এ

বক্তব্যে উদ্দেশ্য এ নয় যে, মানুষ মা-বাপের খোঁজ-খবর নেয়া ছেড়ে দেবে, তাদের হক আদায়ে ত্রুটি করবে ও তাদের সব এহসান ভুলে যাবে। এটা তো খুবই খারাপ কথা, বরং আমার এসব বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, বাড়াবাড়ি ও সীমা লংঘন পরিহার করা এবং কোন্‌টা ওয়াজিব আর কোন্‌টা অনাবশ্যক, মুস্তাহাব ও মুবাহ তা পরিষ্কার করে দেয়া। মা-বাপ গৌণ অর্থে এক ধরনের প্রতিপালক।

তাই তাদের যথাযথ মূল্যায়ন ও আনুগত্য করা দরকার। মা-বাপের হক তো সর্বজনস্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ বিষয়। তাই তার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এ বিষয়ে বাড়াবাড়ি দূর করাই আমার এ আলোচনার মূল লক্ষ্য। অন্যথায় উপরোক্ত সূরতে মা-বাপের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা ওয়াজিব না হলেও মুস্তাহাবে মুআক্কাদা তো বটে। বিশেষ ঠেকা না হলে উক্ত পরিমাণ সম্পদ না থাকলেও নিজে কষ্ট করতে হলেও মা-বাপের খেদমত করা দরকার।

মা-বাপের আদেশে সন্দেহযুক্ত মাল খাওয়া ওয়াজিব নয়

মা-বাপের আদেশে সন্দেহযুক্ত বস্তু খাওয়া ওয়াজিব নয়। কারণ এতে মা-বাপের কষ্ট হওয়ার কিছু নেই। তবে যদি সন্তান মরতে শুরু করে এবং খুব কষ্ট হয় আর মা-বাপ সন্দেহযুক্ত মাল খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে এবং হালাল মাল খেয়ে জীবন বাঁচানোর সামর্থ্যও নেই ; তাহলে মা-বাপের আনুগত্যের স্বার্থে প্রয়োজন পরিমাণ খেয়ে নেবে। তবে যদি আহারকারী পরিচ্ছন্ন হৃদয়ের অধিকারী বুযর্গ হয় তাহলে খাবে না। কারণ, সন্দেহযুক্ত সম্পদে এ ধরনের লোকদের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অনেক ক্ষতি হয়ে থাকে। এটা পরীক্ষিত। এক্ষেত্রে মা-বাপের আনুগত্য করা ওয়াজিব নয়। কারণ, বুঝে শুনে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া নিষিদ্ধ। তাছাড়া এতে আল্লাহ

তাআলার নাফরমানী হয়। আর সৃষ্টির কথায় স্রষ্টার নাফরমানী করা বৈধ নয়। এমতাবস্থায় কষ্ট ভোগ করে যদি মরে যায় আর সন্দেহযুক্ত মাল না খায়, তাহলে অনেক সওয়াব পাওয়া যাবে।

জিহাদের ময়দানে কাফের পিতাকে হত্যা করা যায়

লুবাবুনুকুল নামক কিতাবে আছে যে, বদর যুদ্ধে একদিকে মুসলমান সৈন্যদের সঙ্গে প্রখ্যাত সাহাবী উবায়দা ইবনে জাররাহ লড়াই করছেন। অপরদিকে কাফিরদের সঙ্গে তার মুশরিক পিতা ছেলেকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজছে। উবায়দা (রাযিঃ) যখন দেখলেন যে, আমার কাফের বাপ ইসলামের কারণে আমাকে হত্যা করার পায়তাঁরা করছে ; তাই সুযোগ পেয়ে তিনি পিতাকে হত্যা করে ফেলেন।

হযরত আবূ বকর (রাযিঃ)এর পিতা আবূ কুহাফা কাফের থাকাকালে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে অপ্রীতিকর কিছু উক্তি করে ফেলে। এ কথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাযিঃ) তৎক্ষণাৎ বাপের মুখে এক চড় মারেন। ফলে সে পড়ে যায় এবং উঠে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূবকর (রাযিঃ)কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! দুর্ভাগ্য তখন আমার হাতে তরবারী ছিল না। অন্যথায় তার মস্তকই উড়িয়ে দিতাম এ দুপ্রসংগে সূরা মুজাদালার নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধাচারণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না। যদিও

তারা তাদের পিতাপুত্র ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতিগোষ্ঠী হয়। তাদের শক্তিশালী করেছেন আর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নহর প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

এতে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, আল্লাহর হকের সামনে মাতা-পিতার হকের গুরুত্ব কতটুকু আর এ কথাও প্রমাণিত হলো যে, জিহাদের ময়দানে নিজের জন্মদাতা পিতাকে হত্যা করা জায়েয।

হেদায়া নামক কিতাবে আছে যে, জিহাদের ময়দানে কাফের পিতাকে নিজে না মেরে অন্যকে ইংগিত করে দিবে। এটা মুস্তাহাব। কারণ এতে বাপের প্রতি আদবও রক্ষা হয় এবং কাজও হয়ে যায়। তবে নিজে হত্যা করলেও কোন দোষ নেই।

ফাসেক মা-বাপকে উত্তমভাবে নসীহত করবে

মা-বাপ ফাসেক হলে তাদের উত্তম পন্থায় নসীহত করবে। প্রয়োজনে কিছু ধমক দিলেও তাতে গুনাহ হবে না বরং সওয়াব হবে। দ্বীনি ব্যাপারে কারো প্রতি কোন প্রকার খাতির চলে না। তবে যথাসম্ভব আদব রক্ষা করে চলবে। শরীয়াতের সীমা রক্ষা করে যতটুকু সম্ভব বুঝাতে চেষ্টা করবে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) কাফের বাপকে তার নসীহাত না মানা সত্ত্বেও কোন প্রকার কষ্ট দেননি। প্রথমে তিনি মনে করেছিলেন যে, এ নরম উপদেশই কাজ হয়ে যাবে কিন্তু পরক্ষণে যখন তিনি নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে, ইনি আসলে আল্লাহর দুশমন। আমার নসীহাতে কোনই ফল হচ্ছে না। তখন তিনি বাপের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এহইয়াউল উলূমে আছে যে, আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আঃ)এর কাছে অহী পাঠান যে, "যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার নাফরমানী করে কিন্তু মাতাপিতার কথা মেনে চলে তার আমলনামায় নেক লেখা হয় আর যে এর বিপরীত তার নামে বদ লেখা হয়।"

এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহর হক মা-বাপের হকের চেয়ে কম বরং এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি জায়েয ক্ষেত্রে মা-বাপের আনুগত্য করে; এর বরকতে তার আল্লাহর হক আদায় করা মাফ হয়ে যায় আর যখন মা-বাপের জরুরী হক আদায় না করে তো আল্লাহর হক সম্পর্কিত অন্যান্য আমল করায় মা-বাপের এ নাফরমানী মাফ হয় না। ফলে তাকে নাফরমান সাব্যস্ত করা হয়। কারণ,বান্দার হক আদায় না করলে বা হকদারের কাছ থেকে মাফ নিয়ে না নিলে মাফ হয় না। কেননা, আল্লাহ তাআলা অমুখাপেক্ষী আর বান্দা মুখাপেক্ষী। এর অর্থ এ নয় যে, মা-বাপের অপ্রয়োজনীয় হক আদায় না করলেও আল্লাহর তাবেদারী করা সত্ত্বেও নাফরমান সাব্যস্ত করা হয়। ভালো করে বুঝে নিন।

সন্তানকে উত্তম শিক্ষা প্রদান করা বাপের উপর ফরয

হযরত উমর ফারূক (রাযিঃ)এর কাছে এক ব্যক্তি এসে অভিযোগ করল যে, আমার অমুক ছেলে আমাকে জ্বালাতন করে। এ কথা শুনে তিনি ছেলেকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর না? জাননা যে, বাপের হক কত বড়! ছেলে বলল, হাদীসের আদেশ অনুযায়ী আমার উপর তার (বিশেষভাবে) তিনটি দায়িত্ব ছিল ঃ

(১) ভালো নাম রাখা। (২) উত্তম শিক্ষা প্রদান করা ও (৩) শরীয়াত অনুযায়ী ভালো জায়গায় বিবাহের ব্যবস্থা করা। কিন্তু আমার বাপ এর কোনটিই পালন করেনি। (শিক্ষা ছাড়া কার কি হক তা জানব কি করে

যে, তা আদায় করব) শুনে হযরত উমর (রাযিঃ)এর জন্য আর ছেলেকে কোন শাস্তি দেননি। এবং পিতাকে বললেন, "তুমি বলছ, আমার ছেলে আমাকে কষ্ট দেয়। আমি তো দেখছি যে, সে তোমাকে কষ্ট দেয়ার আগে তুমিই তাকে কষ্ট দিয়ে রেখেছ। আমার সম্মুখ থেকে তুমি উঠে যাও।"

এ হাদীসটি ফকীহ আবুল লায়ছ বর্ণনা করেছেন। বলা বাহুল্য যে, শরীয়াতে প্রত্যেক ব্যক্তির অধিকারের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তদনুযায়ী আমল করে চলা উচিত। মা-বাপও অন্য কারো আর্থিক খেদমত এবং অন্যান্য অনাবশ্যক খেদমত অপেক্ষা যিকর করা উত্তম। ইলমী ইবাদত তো আরো উত্তম। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

আলহামদুলিল্লাহ! এ আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, মা-বাপের শরীয়ত বিরোধী আদেশ পালন করা জায়েয নেই। আর পিতার আনুগত্য করা কোন ক্ষেত্রে ফরয ; কোন ক্ষেত্রে মুস্তাহাব তাও জানা গেল। মোটকথা, মা-বাপের সব আদেশ পালন করা আবশ্যক নয়। নির্ভরযোগ্য একটি হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

نَزِّلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

"লোকদেরকে তোমরা আপন আপন মর্যাদায় স্থান দাও।"

অর্থাৎ যার যতটুকু প্রাপ্য তাকে ততটুকু মর্যাদাই দাও নির্দিষ্ট সীমা থেকে উপরেও উঠাবে না আবার নীচেও নামাবে না। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ব্যাপারে পর্যন্ত সীমাতিরিক্ত প্রশংসা করতে নিষেধ করেছেন। অথচ তার মর্যাদা মাতা-পিতা ইত্যাদি সকলের চেয়ে অনেক বেশী।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ـ

উপসংহার

উস্তাদ, পীর ও স্বামী-স্ত্রীর হক

✪ উস্তাদ ও পীর-মুরশিদের হক অনেক। কিন্তু মা-বাপের চেয়ে কম। অনেকে এ ব্যাপারে ভুল করেছেন। তারা উস্তাদ ও পীরের হককে মা-বাপের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং মা-বাপের হক উস্তাদ ও পীরের চেয়ে কম বলে আখ্যা দিয়েছেন। সম্ভবতঃ তাদের দলীল হলো, মাতাপিতা সন্তানের বাহ্যিক ও দৈহিক তরবিয়াত দিয়ে থাকে আর উস্তাদ ও পীর বাতেনী ও রূহানী তরবিয়াত দিয়ে থাকেন। আর দেহের উপর আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্ট ব্যাপার। কিন্তু তাদের এ দলীল অত্যন্ত দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। কারণ এটা একটা আংশিক শ্রেষ্ঠত্ব সার্বিক নয়। সুতরাং একজনের একদিকে শ্রেষ্ঠ হওয়া আরেক জনের বহুদিকে শ্রেষ্ঠ হওয়ার পরিপন্থী নয়। তাছাড়া কুরআন ও হাদীসে মা-বাপের সম্পর্কে যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে উস্তাদ ও পীর-মুরশিদের বেল্যায় তা দেয়া হয়নি। সর্বোপরি উস্তাদ ও পীর-মুরশিদের বেলায় শুধু তালীমের কারণে হক সাব্যস্ত হয়।

অপরদিকে মা-বাপ নানাপ্রকার কষ্ট স্বীকার করে অপরিসীম স্নেহ ও ভালোবাসা দিয়ে সন্তানকে লালন-পালন করে থাকে। সন্তানের অবাধ্যতা সত্ত্বেও তারা সন্তানের কথা ভুলে যায় না এবং তাদের জন্য নানাপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করে থাকে। কিন্তু উস্তাদ ও পীর-মুরশিদকে দেখা যায় যে, ছাত্র-শিষ্যের সামান্য একটু বিরূপ আচরণকেও তারা বরদাশত করতে পারেন না। আর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে পুরস্কার কর্ম অনুযায়ী হয়ে থাকে। সুতরাং মা-বাপের কর্ম যেহেতু বড় তাই পুরস্কার আর মর্যাদাও বড়ই হতে হবে।

কোন কোন ক্ষেত্রে মা-বাপের স্নেহ উস্তাদের চেয়ে কম এবং উস্তাদের স্নেহ মা-বাপের চেয়ে বেশী দেখা গেলেও তা ধর্তব্য নয়। এমন ঘটনা খুব কমই ঘটে থাকে। তবে একথা ঠিক নয় যে, যেসব উস্তাদ ও পীরের দ্বারা মানবতা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তাদের জান-প্রাণ খেদমত করা দরকার। কিন্তু সীমালংঘন করে নয়। অনেকে বলে থাকেন যে, উস্তাদ ও পীরের নির্দেশ হলে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়া ওয়াজিব। এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বাছ-বিচার না করে সর্বক্ষেত্রে মা-বাপের কথায়ও তো এ কাজ করা যায় না। তাহলে উস্তাদ পীরের বেলায় তো এর প্রশ্নই আসে না। বলা বাহুল্য যে, উস্তাদ যদি ফাসেকও হয় তবুও তাকে শ্রদ্ধা করা এবং তার হক আদায় করার ব্যাপারে ত্রুটি করবে না। তবে তার অপকর্মকে মনে মনে খারাপ জানবে।

স্ত্রীর যিম্মায় স্বামীর হক

✪ স্বামীর সেবা করা ও তার মনোবাঞ্ছা পূরণ করা স্ত্রীর উপর ফরয। স্ত্রী এমন কোন নফল বা জায়েয কাজ করতে পারে না, যার কারণে স্বামীর খেদমত ইত্যাদিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। দুনিয়াতে স্ত্রীর কাছে স্বামীর যতটুকু হক ততটুকু অন্য কারো কারো উপর নেই। যেমন ঃ মেশকাতের এক হাদীসে আছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "আমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সেজদাহ করার অনুমতি দিতাম, তাহলে স্ত্রীকে আদেশ করতাম যেন সে তার স্বামীকে সেজদাহ করে।"

এ হাদীস দ্বারা স্বামীর কত বড় মর্যাদার কথা প্রমাণিত হয় যে, যে ইবাদত আল্লাহর বৈশিষ্ট্য, আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য তা বৈধ হলে স্বামী ছাড়া আর কেউ তার যোগ্য হতো না। তবে স্বামীর সব আদেশ পালন করা স্ত্রীর উপর জরুরী নয়। মা-বাপের হকের বেলায় যে ব্যাখ্যা দেয়া

হয়েছে এখানে তাই প্রযোজ্য। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, মা-বাপের হকের তুলনায় স্বামীর হক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কথাটি বুঝানোর জন্য নমুনাস্বরূপ কয়েকটি মাসআলা লিখে দিলাম।

১। স্ত্রী ও স্বামীর সম্পদ সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক

ইসলাম শরীয়াতে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পদ পৃথক পৃথক গণ্য করা হয়। যে বস্তু ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি ব্যাপারে স্ত্রীর পূর্ণ অধিকার রয়েছে, তা তারই মালিকানাধীন সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। আর যে সম্পদের অনুরূপ স্বামীর অধিকার রয়েছে, তা তারই সম্পদ। যাকাত ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে উভয়ের সম্পদের হিসাব আলাদা আলাদা হবে। এ ক্ষেত্রে মানুষ অনেক ত্রুটি করে থাকে।

২। স্বামীর নির্দেশে ফরয, ওয়াযিব ও সুন্নত ত্যাগ করা যাবে না

স্বামী যদি স্ত্রীর মালিকানাধীন সম্পদ বৈধ খাতে ব্যয় করতে বারণ করে, তাহলে তার আদেশ পালন করা স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব নয়, যদি তা শরয়ী কোন কারণ ব্যতীত হয়। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে কোন সমস্যা সৃষ্টি হতে না পারে। তাই যথাসম্ভব সমঝোতার মধ্যে কাজ করা উচিত। অনেক স্বামী দ্বীনদার না হওয়ার ফলে এ ধরনের ক্ষেত্রে অহেতুক স্ত্রীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে থাকে। অতএব সমস্যা এড়ানোর জন্য জায়েয এবং মাকরূহ তানযিহী বিষয়ে পর্যন্ত স্বামীর আনুগত্য করা যায়। তবে ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুআক্কাদাহ স্বামীর কথায় ছাড়া যাবে না।

৩। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কোন বুযর্গের কাছে মুরীদ হওয়া

স্বামীর অনুমতি না নিয়ে কোন বুযর্গের কাছে মুরীদ হওয়া জায়েয

আছে। তবে কোন সমস্যা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকলে, মুরীদ না হওয়াই ভালো। যেমন ঃ স্বামী যদি মুরীদ হতে নিষেধ করে, তাহলে সমস্যা এড়ানোর খাতিরে মুরীদ হবে না। কিন্তু যদি সাহস হয়, তাহলে আল্লাহর উপর ভরসা করে মুরীদ হয়ে যাবে। এরপরও যদি কোন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে ধৈর্য্য ধারণ করবে। আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের পদে পদে বিপদ এসেই থাকে। আখেরাতে এরা অনেক মর্যাদা লাভ করে। এছাড়া স্বামী যদি কোন মাকরূহ তানযিহী কাজ করার আদেশ করে তার বিধানও এটাই।

৪। স্বামীর বর্তমানে স্ত্রীর নফল ইবাদতের বিধান

স্বামী যদি বাড়িতে উপস্থিত থাকে তাহলে তার অনুমতি বিনা নফল রোযা ও নামায ইত্যাদি জায়েয নাই। কারণ, হয়ত এতে স্বামীর খেদমতে ত্রুটি হতে পারে। হাদীসে স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকার কথা উল্লেখ আছে। তাই যদি স্বামী বাড়ির বাহিরে থাকে তাহলে কোন অসুবিধা নাই। এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যেসব বিষয় স্বামীর অধিকারে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তা স্বামীর অনুমতি ছাড়া করা জায়েয নাই। আর সব কাজই শরীআত মোতাবেক করা দুরস্ত আছে।

৫। স্ত্রীর জন্য স্বামী ছাড়া অন্য কারো কাজ করা

স্বামী যদি বিনা ওজরে স্বামীর নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন বা অন্য কারো কোন কাজ বিবির দ্বারা করাতে চায় তাহলে স্ত্রীর উপর সে কাজ করা জরুরী নয়। যেমন কারো জন্য খানা পাকান বা কাপড় সেলাই করান অথবা এমনই অন্য কোন কাজ করান, আর যদি কোন ওজরবশতঃ করাতে হয় তাহলে যেহেতু এ কাজ না করার দরুন স্বামীর কষ্ট হবে তাই সে কাজ করে দেয়া স্ত্রীর জন্য অপরিহার্য।

ফায়েদা ঃ মহিলা যদি (কঠোর বাধ্যতাবিহীন) কোন পরপুরুষের কাপড় সেলাই করে দেয়, তাহলে সে ব্যক্তি যদি দ্বীনদার হয় এবং কোন অঘটন ঘটার সম্ভাবনা না থাকে তাহলে কোন গুনাহ হবে না। আর যদি সে ব্যক্তি পাপীষ্ঠ ও গুনাহগার হয় এবং কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তাহলে উক্ত ব্যক্তির কাপড় সেলাই করা জায়েয হবে না, কারণ অনেক কপট ব্যক্তি সেলাই দেখেই আনন্দ উপভোগ করে অতিরঞ্জন থেকে বাঁচানোর জন্য নমুনাস্বরূপ এ সামান্য নিবন্ধ লিপিবদ্ধ হলো। যেন জানতে পারে যে, কোথায় স্বামীর আনুগত্য অত্যাবশ্যক আর কোথায় অনাবশ্যক।

প্রকৃতপক্ষে শরীয়তসম্মতভাবে স্বামীর আনুগত্য যত সামান্যই হোক না কেন তাই অনেক উত্তম। এমন মহিলারা জান্নাতের উচ্চস্তরে সমাসীন হবে। কিন্তু নফল ইত্যাদির ব্যাপারেও সচেতন থাকবে, কেননা মানব সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার আনুগত্য। যার বিস্তারিত বিবরণ অর্থাৎ কখন আল্লাহ তাআলার যিকির পিতামাতার অহেতুক আনুগত্য অপেক্ষা উত্তম, সে ব্যাপারে সবিস্তার আলোচনা উপরে বর্ণিত হয়েছে। তা এখানেও প্রযোজ্য হবে।

ؔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے ٭ یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے-

দুনিয়া চিত্তবিনোদনের স্থান নহে, এটা হলো উপদেশ গ্রহণের স্থান, আমোদ-প্রমোদ বা তামাশার স্থান নহে।

আল-হামদুলিল্লাহ, প্রয়োজনীয় পরিশিষ্ট সমাপ্ত হলো, আল্লাহ তাআলা কবুল করুন এবং একে মানুষের উপকারী বানান, আমীন।

সমাপ্ত